রাজকন্যার নাম সুচিত্রা

পরেশ চক্রবর্তী

চক্রবর্তী এ্যাণ্ড কোং

১২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা :
রীতা চক্রবর্ত্তী
বেহালা
কলিকাতা-৩৪

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট :
প্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর :
শ্রীমহাদেব মণ্ডল
রূপরেখা-প্রেস
[illegible] মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

দাম : চার টাকা

উৎসর্গ

নিগূঢ়ানন্দ—কে

RAJKANYAR NAM SUCHITRA

BENGALI NOVEL

By : PARESH CHAKRAVARTI

Price : *Rupees Four*

এক

সেদিন জমীদার রাজ নারায়নবাবুর বাটী হইতে যাত্রা গান শুনিয়া আসা অবধি অপরেশের যেন কি হইল। যখন তখন অপরেশ হঠাৎ গাহিয়া উঠে, কখনও অকারণে হঠাৎএকটু মৃদু হেসে, কখনও একান্ত গম্ভীর হইয়া পড়ে ঠিক যেন পাগলের ভাব, লোকে কিছু বুঝিতে পারে না।

সকাল বেলা নিদ্রা ভঙ্গ হইতেই অপরেশের মনে পড়িল যাত্রা গানের সেই পয়ারটি ঃ—

"আজ প্রভাতে কি হল গো হৃদয় গেছে খুলি"। কোমল শয্যা বক্ষ হইতে মাতৃ ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় পরম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে শায়িত অবস্থাতেই, সে প্রশান্ত চিত্তে গানের সুর ধরিল।

ছোট বোন অর্পনা আসিয়া কহিল—"খুব তো গান হচ্ছে ওদিক —বলিয়াই বিদ্যুৎ গতিতে অন্তর্ধ্যান করিল। অপরেশের বুঝিতে বাকি রহিল না যে মাষ্টার মহাশয় আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও যত শীঘ্র সম্ভব হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক তাহাকে শেলেট পুস্তক বগলে লইয়া পড়িবার ঘরের দিকে রওনা হইতে হইল।

পাঠাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলে মাষ্টার মহাশয় রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে অপরেশবাবু—নিদ্রা ভঙ্গ হল?

অপরেশের ঠাট্টা ভাল লাগিল না। সে নিরুত্তরে শেলেট পেন্সিল লইয়া লিখিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ওকি হচ্ছে? অপরেশ উত্তর করিল—"অঙ্ক করছি।

"অঙ্কটা না হয় আজ থাক্—অনেক দিন তোমার বাংলা হাতের লেখা দেখিনি আজ একটু বাংলা লেখ কেমন ? সেই যেন—

"প্রভাত কাননে আজি ফুটিয়াছে ফুল।"

মুখস্ত লিখতে পারবে তো ?

কেমন একটা কৌতুক আগ্রহে দৃষ্টিতে অপরেশ মাষ্টার মহাশয়ের দিকে তাকাইল। তাহার মনে কেমন এক অভূত পূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল, সে নিরুত্তরে ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইল। অপরেশ লিখিতেছে তো বিরাম বিহীন লিখিয়াই চলিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞসা করিলেন, "কি হে লেখা হল ? এত সময় লাগবার তো কথা নয় !

অপরেশ জানাইল তাহার লেখা শেষ হইয়াছে" মাষ্টার মহাশয় তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। অপরেশ আবৃত্তি করিল—

"প্রভাত কাননে আজি ফুটিয়াছে ফুল
নিশীর ঘুমন্ত কলি হয়েছে চটুল।
শ্বেত, পীত, নীল, লাল কত নানা জাতি
গোলাপ, বকুল, জবা ফুটেছে মালতী ॥ ইত্যাদি

মাষ্টার মহাশয় শেলেট খানা চাহিয়া লইয়া বানান শুদ্ধ হইয়াছে কিনা দেখিতে লাগিলেন। প্রথম লাইন পাঠ করিয়া দ্বিতীয় লাইনে আসিতেই কেমন যেন খট্‌কা লাগিল কথাটা কি অপরেশ নিজেই কবিতা রচনা করিয়াছে। গোলাম মোস্তাফার কবিতার ছন্দ ও ভাবের সহিত কোথাও উহার এতটুকু সামঞ্জস্য নাই। অপরেশ যখন কবিতাটি নিজে আবৃত্তি করিয়া ছিল মাষ্টার মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই। কারণ কবিতাটি তাঁহার মুখস্ত ছিল না। এক্ষণে বানান শুদ্ধ করিতে যাইয়া তাহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে তিনি মনে মনে প্রকৃত কবিতাটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

"[illegible]ত কাননে আজি ফুটিয়াছে ফুল"

"আঃ দুঃ ছাই আর মনেও পড়েছে না। পুনরায় তিনি আবৃত্তি করিলেন—

"প্রভাত কাননে আজি ফুটিয়াছে ফুল
গোলাপ, চামেলি, বেল, চাপা ও পারুল"

ঠিক্,-ঠিক্—, তাইতো বলি কবি নিজেই কবিত্ব করেছেন। এই কি লিখেছিস্?

অপরেশ চক্ষু ছানা বড়া করিয়া কহিল—"কেন, কি হল?

"কি হল বইটা একবার বের কর্ দিকিন?

অপরেশ মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পুস্তকটি আগাইয়া দিল। মাষ্টার মহাশয় খুলিয়া গোলাম মোস্তাফার কবিতাটি বাহির করিলেন। পাঠক বর্গ দেখুন গোলাম মোস্তাফার কবিতার সংহিত উহার কেমন সাদৃশ রহিয়াছে।

ফুল

গোলাম মোস্তাফা।

"প্রভাত কাননে আজি ফুটিয়াছে ফুল
গোলাপ,চামেলি, বেল, চাঁপা ও পারুল
কেহ আছে মুখ তুলে
কেহ বা নাচিছে দুলে
রূপে গুনে ওরা সব ধরায় অতুল॥"

ফুল

অপরেশ চট্টোপাধ্যায়।

প্রভাত কাননে আজি ফুটিয়াছে ফুল
নিশীর ঘুমন্ত কলি হয়েছে চটুল।
শ্বেত, পীত, নীল, লাল কত নানা জাতি
গোলাপ, বকুল, জবা ফুটেছে মালতী।

মাষ্টার মহাশয় কবিতাটি পাঠ করিয়া আর কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি কবিতাটি অপরেশের পিতাকে দেখাইবার নিমিত্ত কবিতাটি সমেত তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন ও খানিকক্ষণ উহা লইয়া আলাপ আলোচনা হাসি তামাসা অন্তে দুই ছিলুম তামাকু সেবন করিয়া অপরেশ কে পড়াইবার কথা বিস্মৃত হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল তবুও যখন মাষ্টার মহাশয় ফিরিলেন না, অপরেশ পুঁথি পুস্তক সমস্ত গুটাইয়া ফেলিল। তাহার মোটেই ইচ্ছা করিতেছিল না। কেবল বার-বার আপনি রচনা করিয়া কবিতা বলিতে গান গাইতে ইচ্ছা করিতে ছিল। সে স্বাধীনতার কেমন যেন একটা মাদাকতা আছে। অপরেশ নিজেই অনেক সময় বুঝিতে পারে না সে কি বলিতেছে, তবু সে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক আনন্দ অনুভব করে। অপরেশ সুর তুলিয়া গাহিতে লাগিল—

"আজ প্রভাতে কি হল গো হৃদয় গেছে খুলি।
আয়গো তোরা আয়রে সবে দিইগো কোলাকুলি।"

মাষ্টার মহাশয় নাই দেখিয়া ও বাড়ীর খ্যাঁদা আসিয়া উপস্থিত। খ্যাঁদা বলিল—

"হ'ল নারে হল না। তোরা হবে না—সখী হবে। "এই ছাখ আমি গাই।

খ্যাঁদা ঢং করিয়া নৃত্যের ভঙ্গিতে গাহিল—

"আজ প্রভাত কি হল গো হৃদয় গেছে খুলি
আরগো সখী আর তোরা সব দিই গো কোলাকুলি॥"

খ্যাঁদা থামিয়া গেল। কারণ রাজ নারায়ন বাবুর বাটী সে যে গান শুনিয়া ছিল হুবহু তাহারই দুপয়ার গাহিয়াছে। বাকী পয়ারগুলি তাহার মনে নাই। খ্যাঁদা জিজ্ঞাসা করিল—

"তারপর যেন কিরে অপর্ণা?

অপরেশ মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিল

"ঐ ছাখ বনের কোলে—

খ্যাঁদা তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল "ঠিক ঠিক্ মনে পড়েছে রে মনে পড়েছে—। সে গাহিল—

"ঐ ছাখ বনের কোলে রাশী

রাশী হাসছে কুসুম কলি।

"আঃ তার পর ছাই কিছু মনে পড়ছে না। হ্যারে বলনা তারপর কি ?

অপরেশ বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিল।

"আয়রে খ্যাঁদা ওদের সাথে মনের কথা বলি।" খ্যাঁদা তাহাকে থামাইয়া বলিল—

"হলনা রে হল না। বানিয়ে বললেই যদি মত দাড়া আমি মনে করছি। হ্যাঁ ঠিক মনে পড়েছে।

"আয়না সখী ওদের কাছে মনের কথা বলি।

দেখনারে ঐ পাখনা নেড়ে আসছে ভ্রমর ধেয়ে

আঃ বড্ড ভুলে যাই।

অপরেশ কিন্তু অমনি অনায়াসে পরের লাইন টুকু পূরণ করিয়া দিল। অবশ্য নিজের রচনায়।

"গাছের ডালে টুনটুনটা দেখছি চেয়ে চেয়ে"

খ্যাঁদা বলিল "হলনা রে হল না। আঃ ছাই মনেও পড়ছে না। থাক্ তুই যেন কি বল্লি ? অপরেশ বলিয়া দিল খ্যাঁদা নাচিয়া-নাচিয়া ঐ পয়ারের পুনরাবৃত্তি করিল। খ্যাঁদা বলিল—

"আচ্ছা তুই বলে দে আমি গাই কেমন ?

অপরেশ তো তাহাই চায়। আজ যে তাহার হৃদয়ে কবিতার গান ডাকিয়াছে। সে তৎক্ষনাৎ প্রমোদ আরম্ভ করিল। খ্যাঁদা নাচিয়া নাচিয়া গাইতে লাগিল ঠিক তৎমুহূর্ত্তে অপরেশের ছোট বোন অর্পনা আসিয়া প্রবেশ করিল। সে অপরেশদের

আনন্দ দেখিয়া যেন ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। বলিল, দাদা লেখা পড়া বাদ দিয়ে গান হচ্ছে—খঁ্যাদা দাদার পড়া নষ্ট করছিস্! দাঁড়া—। উভয়কে ভয় দেখাইয়া অর্পনা প্রস্থান করিল। কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না এখনি মার নিকট গিয়া নালিশ আরম্ভ হইবে। বেগতিক দেখিয়া খিরকির দোর দিয়া খঁ্যাদা পলায়ন করিল। অপরেশ শেলেট পেন্সিল লইয়া কি ছাই পাস লিখিতে লাগিল তাহা সেই জানে। খানিক বাদে সত্যি মা আসিয়া অপরেশকে লেখা পড়া বাদ দিয়া গান করার অপরাধে তিরস্কার করিয়া গেলেন। মা তিরস্কার করিয়া গেলেন বটে কিন্তু অপরেশের মন আর লেখাপড়ায় বসিল না। সে খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিল। একবার এটা একবার ওটা ধরিয়া টানাটানি করিল। কিছুতেই মন উঠিল না। অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া সুখ-দুঃখের সাথী খঁ্যাদার খোঁজে পথে বাহির হইল।

দুই

খঁ্যাদা ও অপরেশদের বাড়ী পাশাপাশি। উভয় বাড়ীর মধ্য দিয়া উত্তরে দক্ষিণে এক বিরাট জেলা বোর্ডের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সেই পথের পশ্চিম পার্শ্বে অপরেশদের নিজেদের জমীতে এক বিরাট বকুল গাছ। এ বাড়ী ও বাড়ীর মাঝখান্‌টায় খানিকটা স্থানে ছায়া প্রদান পূর্ব্বক সকলের অভিভাবকের মত দীর্ঘ কাল হইতে বিরাজ করিতেছে। গ্রীষ্মে কত খানিক আসিয়া এর ছায়ায় শ্রান্তি আপনোদন করে। বার মাস ইহার ডালে ডালে ফুল ফুটে। ফুল ঝরে। সৌখীন ফুল পিয়াসিরা ফুটে, মালিকা গাঁথে, গলায় পরে গ্রামের কিশোর কিশোরীরা প্রত্যহ এখানে ভীড় জমায়।

কে লেখা পড়া বাদ দিয়া গান করার অপরাধে তিরস্কার করিয়া গেলেন। মা তিরস্কার করিয়া গেলেন বটে কিন্তু অপরেশের মন আর লেখা পড়ায় বসিল না। সে খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিল। একবার এটা একবার ওটা ধরিয়া টানা টানি করিল। কিছুতেই মন উঠিল না অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া সুখ-দুঃখের চিরসাথী খঁ্যাদার খোঁজে পথে বাহির হইল।

গ্রামের কিশোর কিশোরীরা প্রত্যহ এখানে ভীড় জমায়। অপরেশ আসিয়া বকুল তলায় দাঁড়াইল। অজস্র ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ সে যখন এখানে আসে ফুল না কুড়াইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু আজ তাহার ফুল কুড়ান ভাল লাগিল না। কেবল মনে হইতে লাগিল অনিমেষ দৃষ্টিতে ফুল গুলির দিকে তাকাইয়া থাকে, কেন যেন ফুলগুলি দেখিয়া আপনা আপনিই বুকে একটা দোল দিয়া উঠে। মনে হয় কণ্ঠের সুরে সুরে এই

অব্যক্ত শিহরণটিকে বাধা-বন্ধ হীন উন্মুক্ত প্রান্তরে ছড়াইয়া দেয়। হঠাৎ কি একটা পয়ার সে গাহিল।

"ধুলায় পড়া ওরে আমার ঝরা বকুল ফুল।

অপরেশ যেমন খ্যাঁদাকে খুজিতে খুজিতে বকুল তলায় আসিয়াছে, সাথী হারা খ্যাঁদাও তেমনই অপরেশের অপেক্ষায় বকুল তলায় আসিয়া দাঁড়াইবে মনে করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল, খ্যাঁদা দেখিতে পাইল তাহার বহু পূর্ব্বেই অপরেশ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অপরেশ কিন্তু খ্যাঁদার উপস্থিতি বুঝিতে পারিল না। কারণ তখন সে ভাবে বিভোর ছিল, খ্যাঁদা গাহিল—"আমি বাজাই রে ঢাক ঢোল।"

অপরেশের ধ্যান ভঙ্গ হইল, বলিল—

"বাঃ—ঢাক ঢোল বাজাই কিরে?"

"কেন ধুলায় পায় পড়া ওরে আমার ঝরা বকুল ফুল আর আমি বাজাইরে ঢাক ঢোল"—মিলেনি?

অপরেশ হাসিয়া বলিল—"কোথায় বেগুন বাড়ী কোথায় বা ডুব পারি। ঝরা ফুলের পর ঢাক ঢোল বাজালেই হল! কোন মানেই নেই, কিছুই নেই, আর মিলই বা কি,—ঝরা ফুল, আর ঢাক ঢোল। খ্যাঁদা মনক্ষুন্ন হইয়া বলিল "কিন্তু অর্থ হল না কোথায় শুনি? ঝরা ফুল কুড়াতে আনন্দ হয় না; আর আনন্দ হলেই তো লোকে ঢাক ঢোল বাজায়।"

"কেন এবার তুই আর এক পয়ার বলেই দেখ্ না।"

অপরেশ বলিল—"আমার কবিতা বলার প্রয়োজন ও নেই তোমার মিল দেবার দরকারও নেই।"

খ্যাঁদা একটু অভিমানের সুরে বলিল—"কবিতা বলতে পারিস তাই দেমাক হয়েছে, তবে থাক ভাই কবিতা নিয়েই থাক। আঁমরা মিল দিলেও হবে না, আর ও বললেই হল। এতে আর রাগেই কি হল শুনি? সত্যি বললে—যদি রাগ হয় তবে—"

"সত্যিই বল্, আর নিজেই বল, ও আসলে দেমাকে ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"ওঃ—কবিতা বলিনি বলে রাগ হয়েছে—কিন্তু আমি ভাবছিলুম কি—"

নিমিষে সর্ব্ব অভিমান বিস্মৃত হইয়া খ্যাঁদা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?"

"আমিও কদিন ঐ কথাই ভাবছিলুম।"

"ভাবছিলুম কি, যাত্রার দল করলে হয় না ?"

অপরেশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"কিন্তু……।"

"কিন্তু কি ?"

"লোক পাব কোথায় ?"

"ওঃ এই কথা।" খ্যাঁদা যেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাঁহার ভাবে মনে হইল সে যেন কোন কঠিনতর সমস্যার কথা শুনিবে আশা করিয়াছিল। এ প্রস্তাব তো তাহার নিকট জলবৎ তরলং।

খ্যাঁদা বলিল "আচ্ছা তুই দাঁড়া আমি এক্ষুণি আসছি।" বলিয়া সে এক দৌড়ে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণ কাল পরে দেখা গেল টুনু পুঁটি ভোলা কাহারও হাত, কাহারও ঘাড় ধরিয়া কাহাকে বা কাঁধে করিয়া বিরাট এক বালক দল সহকারে খ্যাঁদা এই দিকে আসিতেছে। অপরেশের নিকট আসিয়া খ্যাঁদা বলিল—"নে হলোত! লোকের আবার ভাবনা।"

অপরেশ বলিল "বেশ তবে ওদের বিকেলে আসতে বলে দে।"

খ্যাঁদা বালক দলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"এই তোরা সব আজ আজ বিকেল এখানে আসবি। বুঝলি! আসবি তো ?"

বালক দল সমস্বরে প্রশ্ন করিল—"কেন, কেন খ্যাঁদ্দা?

খ্যাঁদা বলিল—"আমরা যাত্রা গান গাব।"

যাত্রা গানের কথা শ্রবণ করিয়া বালক দল আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। খঁ্যাদা তাহাদের কেমন প্রকারে থামাইয়া গৃহাদি মুখে পাঠাইয়া দিল।

"বিকেল আসবি কিন্তু?"

বালক দল সানন্দে সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

সম্মতি না জানাইয়াও উপায় নাই। কারণ লিডার খঁ্যাদার আদেশ অমান্য করিবার সাহসও তাহাদের নাই। তাহা হইলে অবশ্যই কোন দিন বিকেল বেলা কালী বাড়ীর মাঠে তাহার হাতের দক্ষিণা সেবন করিতে হইবেই। অপরেশ বলিল "তবে একটা নাটক লিখতে হয় কেমন? "নিশ্চয়ই। এক্ষণি বাড়ী গিয়ে লিখতে বস্‌গে যা! আমি চট্ করে চাট্টে খেয়ে আসছি। হয়তো একটু দেরীও হতে পারে। মাকে ফাঁকী দিয়ে আসতে হবে তো। আর বলিস্‌নে ভাই। আমার যে কি মা-ই হয়েছে। খেয়ে দেয়ে একটু ঘরের বাইরে পা দিয়েছি কি অমনি "এই কোথায় চললি, কোথাও বেরবিনা কিন্তু, এক্ষুনি পড়তে বস্‌তে হবে—"নানা আদেশ একত্রের কথা অমান্য করবি কি সাথে সাথে—। তাই না মা ঘুমোলে চুপি চুপি পালিয়ে আস্‌তে হয়। থাক্ গে সে কথা! আমি ঠিক্ আসবোখন। তুই লিখতে বসগে যা। ভীমের পার্টটি খুব ভাল করে লিখবি কিন্তু", বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষায় না করিয়া খঁ্যাদা দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

তিন

অপরেশ বাড়ী আসিয়াই নাটক রচনায় মনোনিবেশ করিল। ছোট আকারের খাতার উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিল "সীতা হরণ"। খ্যাঁদার নির্দ্দেশ তাহার মনেও রহিল না। অপরেশ মাঝে মাঝে আবার কৃত্তিবাসের রামায়ণ খানি পড়িত। সুতরাং জীবনের প্রথম রচনাতে তাহার অজ্ঞাত-সারেই রামায়ণের প্রভাব তাহার কাহিনীতে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। অপরেশ লিখিতে লাগিল 'পঞ্চবটীর কাহিনী'।

অপরাহ্ণের বিদায়ী সূর্য্য কিরণে পঞ্চবটী এক মধুর রূপ মাধুরী ধারন করিয়াছে। শাখে শাখে ফুল, ফুলে ফুলে ভ্রমর, ভ্রমরে ভ্রমরে গুঞ্জরণ, অপরিচিত মনমোহিনী বিহগ কুজন, দক্ষিণা মৃদু মন্দ সমিরণ, চপলা হরিণী নৃত্য, নিমেষে যেন সকল মন প্রাণ চুরি করিয়া লইয়া যায়।

অপরেশ লিখিতে লাগিল এমনি এক মধুর বৈকালে সীতাদেবী একাকিণী কুটিরে রহিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র মৃগয়ায় গিয়াছেন। পাগল হাওয়া একাকিনী জানকীর প্রাণে আঘাত হানিতেছে। ধীরে ধীরে শ্রীরামচন্দ্রের উপর সীতাদেবীর অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। আজ তিনি রঘুনাথ কুটীরে ফিরিলে তাহার সহিত কথাই বলিবেন না। সীতাদেবী অধৈর্য্যা। শ্রীরামচন্দ্র তবুও কুটীরে ফিরিতেছেন না! অবশেষে রঘুনাথ কুটীরে ফিরিলেন। অনেক অনুরোধ করিয়া তবে না সীতার মান ভাঙ্গানো সম্ভব হইল। এই গেল প্রথম দৃশ্যের কাহিনী। সম্পূর্ণ কল্পনার উপর রচিত। নাটক অতি ক্ষুদ্র। মাত্র দুই দৃশ্যে সমাপ্ত হইবে। দ্বিতীয় দৃশ্যে অপরেশ রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিল। ছন্দে ও সুরে

তাহা সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসের অনুকরন হইল। সুন্দর সোনালী রৌদ্রে আলোকিত মধুর প্রভাত। সীতাদেবী কুটীরের বাহিরে আসিতেই দেখিতে পাইলেন এক মনমোহিনী নয়ন-মুগ্ধকর মনিমাণিক্য খচিতা হরিণী! অমনি শ্রীরামচন্দ্রকে কুটীরের বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া ঐ হরিণী দেখাইয়া উহা ধরিয়া দিবার জন্য বায়না ধরিলেন। তাহাও আবার জ্যান্ত ধরিয়া দিবার বায়না। প্রিয়তমা প্রিয়ার অনুরোধ এড়ান অসম্ভব। শ্রীরামচন্দ্র হরিণী ধরিতে ধনুর্ব্বান হস্তে ছুটিলেন। লক্ষণ বাধা দিল। বলিল—হরিণী কি কখনও মাণিকের হইতে পারে? তুমি ফের। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডাইবে কে? শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র কিছুক্ষণ হরিণী ধরিতে গিয়াছেন। সীতার মন প্রাণ উদ্‌বেল। কখন সেই মণিমাণিক্যের হরিণী লইয়া প্রভু উপস্থিত হইবেন। অকস্মাৎ একি! যেন শ্রীরামচন্দ্রেরই কাতর আহ্বান শোনা যাইতেছে! সীতাদেবী অস্থির হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন। লক্ষণ উহাকে রাক্ষসের মায়া বলিয়া হাসিয়া উড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সীতার মন মানিবে কেন? তিনি লক্ষণকে অনুসন্ধান করিয়া আসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা লক্ষণ অনুসরণ করিয়া কুটীর হইতে নিস্ক্রান্ত হইল। অপরেশ নাটকের ঘটনার এই পর্যন্ত লিখিয়াছে এমন সময় খ্যাঁদা আসিয়া সেখানে প্রবেশ করিল।

খ্যাঁদা নাটকটির দিকে সোৎসাহে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বা বাঃ একেবারে দেখি অনেকখানি লিখে ফেলেছিস্। ভীমের পার্টটি ভাল করে লিখলি তো!"

অপরেশ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"ভীম! ভীম আবার কোথায়?"

"ভীম দিসনি! তবে কি ছাই দিয়েছিস্ শুনি? বলিয়াই খ্যাঁদা অপরেশকে লিখিবার অবকাশ না দিয়া ছোঃ মারিয়া
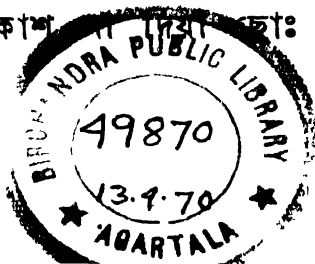
খাতাটি টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। পাঠান্তে বদন বিকৃত করিয়া কহিল—"কি ছাই ঘোড়ার ডিম করেছিস্? ভীম নেই, দ্রৌপদীর বস্ত্র নিয়ে টানাটানি নেই, কি লিখেছিস্?"

অপরেশ বলিল; ভীম আবার আসবে কোত্থেকে? এখন তো লঙ্কার রাজা রাবণ এসে সীতাকে চুরি করে নিয়ে যাবে। খ্যাঁদা মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "চুরি করবে না তোর মাথা করবে। ভীম না দিলে কখনও যাত্রাগান হয়। ফেলু ছুতোর সেদিন কেমন ভীমের পাঠ করলে?"

"যা হোক তুই রাবণের বদলে ভীম বসিয়ে দে।"

অপরেশ বলিল—"বাঃ সে কেমন করে হয়!"

"তবে যা করবি আমায় বাদ দিয়ে।"

অপরেশ ভারি মুস্কিলে পড়িল। একধারে ভীম অপর ধারে যাত্রা। যাত্রা গান বাদ দিলেও চলে না। আজ কত দিন হইল সে ঐ যাত্রা গানের কল্পনা করিয়া আসিতেছে। অগত্যা সে বলিল—"নে তাই হবে।" অপরেশ বলিল—ছদ্মবেশে ভীমের প্রবেশ।

ভীম,—'ভিক্ষা দাও কুটীরেতে কে বা আছ মাগো। খ্যাঁদা বিরক্ত হইয়া বলিল "তুঃ ছাই ভীমের গরম না হলে হয়। তুই দে আমি ভীমের পাঠ লিখছি—বলিয়া সে অপরেশের হাত হইতে কলম টানিয়া আরম্ভ করিল।

ভীম—কৈ ঘরে কেবা তুই বেরো তাতাতাড়ি।
দেরী হলে গদা দিয়ে মারব মাথায় বাড়ি॥
দেরী করতে মোটেই পাবে না যে আর।
কুরুক্ষেত্রে অনেক কাজ রয়েছে আমার॥
কৈ বেরুসিনে? ভাল ভাবে আয়।
নইলে কান ছিড়ে দেব একটি মলায়॥

খ্যাঁদা অপরেশকে বলিল, "নে, এইবার তুই সীতার পার্টটি লেখ্ তো? সীতার পার্ট নরম হওয়াই ভাল।"

অপরেশ লিখিল—

—সীতা—"লও ঠাকুর লও এই ভীক্ষা লও।"

অপরেশ আরও লেখিতে যাইতেছিল। খ্যাঁদা তাহাকে থামাইয়া দিল। বলিল—"দাঁড়া এখন আমি ভীমের পার্টটি লিখি। বলা বাহুল্য তাহার মস্তকে ভাব জমিয়া গিয়াছে। খ্যাঁদা লিখিল।

ভীম। কি আমি ভিক্ষে নেব তুই ভেবেছিস কি?
এখনি বা মাথায় তোর গদার বাড়িদি!
জানিস্ আমার নাম ভীম, ডরাই আমি কারে।
গদা দিয়ে লাগাই বাড়ি সামনে দেখি যারে॥
শোন্ শোন্ ওরে ওরে ভাঙ্গবো উরু তোর।
কি বলব আর তোরে পাজি ব্যাটা চোর॥
এই বেণী তোর আমি করিব সংহার।
মাথাটা এগিয়ে দে সয় না দেরী আর॥

খ্যাঁদা বলিল—"এখন তবে গদার বাড়ী দিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে সীতাকে নিয়ে যাই কেমন? তাই ভাল হবে। অপরেশের কিছু বলিবার নাই। এমন যে গুণের বন্ধু তাহাকে উপদেশই বা কি দেওয়া যাইতে পারে।"

সে উহাতেই সম্মত হইল। অতএব তাহাই হইল। ভীমের আঘাতে সীতার পর্ণ কুটীর গুড়াইয়া গেল। ক্রুদ্ধ ভীম সীতার কেশ ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—

ভীম, চল চল বেণী তোর করিব সংহার।
আমি ভীম মোর সাথে কে পারিবে আর॥

বেণী সংহার কথাটি খ্যাঁদার যাত্রা গানের আসর হইতে শোনা। ভীমের মুখেই উহা শুনিয়াছিল সুতরাং সীতার বেলাতেও উহার প্রয়োগ করিতে ভুলিল না, অপরেশ কিন্তু খ্যাঁদার ভীমের

অবতারনায় বিশেষ সুখী হইতে পারিল না তবে মুখে সে কথা প্রকাশ করিরার উপায় নাই কারণ খ্যাঁদা অভিনয় করিবে। খ্যাঁদা ব্যতীত যখন অভিনয় হইবে না তখন ভাল হোক, মন্দ হোক খ্যাঁদার ডিরেক্‌সন মানিতেই হইবে।

যথা সময়ে পাঁচ সাত দিন তোড় জোড় সহকারে রিহার্সেল চলিল। অদ্য তাহাদের অভিনয় হইবে। খ্যাঁদা আজ সারাটা দিন কাজে ব্যাস্ত।
তাহার একটুও অবসর নাই। ষ্টেজ্‌ বাঁধিতে ও ত্রিপল টাঙ্গাইতেই তাহার সারাটা দুপুর বহিয়া গেল।

বৈকাল বেলা গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা ভদ্র-অভদ্র সকলকেই নিমন্ত্রন করা হইল অভিনয় দেখিবার জন্য। ভুনো ডুনো যে যাহার বাড়ী হইতে তাহাদের দিদিরা শাড়ী ব্লাউজ লইয়া আসিল। খ্যাঁদা খড়ি মাটির গুড়ো দিয়া সকলকে সাজাইয়া দিতে লাগিল। ও পাড়ার মধুকে ওর রথে কেনা ঢোলকটি লইয়া আসিতে বলা হইয়াছিল।

বলাই বাঁশী বাজাইতে পারে কিছু কিছু, সুতরাং তাহাকে বাঁশীটি লইয়া আসিতে বলা হইয়া ছিল।

যথাসময়ে উহারা সকলে আসিয়া অভিনয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। 'কন্‌সার্ট আরম্ভ হইল। খ্যাঁদা মাঝে মাঝে সাজঘর হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া যাইতে লাগিল। গ্রামের কোন ছেলে পেলেই বাদ যায় নাই, সকলেই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে। তৎব্যাতীত দুই চার জন ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয় অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন।

উহাদের ক্ষুদ্র আসর তখন পরিপূর্ণ। খ্যাঁদা সকলকে সাজাইয়া গুছাইয়া প্রস্তুত করিয়া নিজে একবার বাহিরে আসিল। উদ্দেশ্য মুখবন্ধ কিছু বলা। সে আসরে দাঁড়াইয়া মার্জ্জিত অমার্জ্জিত ভাষায়

নাটক ও নটদের পরিচয় দিতে লাগিল। খ্যাঁদা বক্তৃতার ঢংয়ে কহিল—

"ভদ্র মহোদয়গণ—

আজ আমরা সীতা হরণ বই যাত্রা করিব। বই লিখেছে আমাদের অপরেশ। পাঠ করিতেছে—

রাম—শ্রীযুক্ত অপরেশ চট্টোপাধ্যায়।

সীতা—শ্রীযুক্ত টুনুরাম বন্দোপাধ্যায়।

লক্ষন—শ্রীযুক্ত ভুনু চন্দ্র ঘোষ। ইত্যাদি...

আমাদের অনেক ভুল হইবে। আপনারা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।"

বলা বাহুল্য খ্যাঁদা নিজে কোন ভূমিকায় অবতরণ করিবে তাহা সে গোপনই রাখিল।

খ্যাঁদার পার্ট সর্ব্ব শেষে। সুতরাং তাহাকে বিলম্বে সাঁজিলেও চলিবে।

যথাসময়ে নাটক আরম্ভ হইল। বালক সুলভ রচনা হইলেও সকলে রচনা চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইল। না হইবেই বা কেন কবিও তো বালক বৈ নয়!

এতটুকু ছেলে সে কেমন করিয়া এমন নাটক রচনা করিল সকলে অবাক। সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনেতাদের বিশেষ করিয়া বালক কবির বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। বালক দলের আনন্দ আর ধরে না। এমনি করিয়া গৌরবের মাঝেই নাটকের প্রথমদৃশ্য সমাপ্ত হইল। দ্বিতীয় দৃশ্য আরম্ভ হইল। সীতার অনুরোধে শ্রীরাম চন্দ্র হরিণ ধরিতে চলিলেন।

রামের বিপদ অনুমান করিয়া কিয়ৎ কাল পর সীতা দেবী রাক্ষসের—মায়ায় বিভ্রান্ত হইয়া লক্ষনকে রামের অনুসন্ধানে পাঠালেন। এমন্ সময় স্বয়ং খ্যাঁদারাম ভীমের ভূমিকায় দর্শককুল প্রকম্পিত করিয়া রঙ্গ মঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। দর্শকবৃন্দতো

হাসিয়াই আকুল। ভিক্ষা করিতে রাবণ রাজা আবার গদা হস্তে কেন? তৎপর ভীম যখন উচ্চ চিৎকার করে "ঘরে কেবা তুই" বলিয়া পাঠ আরম্ভ করিল—হাসিতে হাসিতে দর্শকদের পেটে খিল ধরে আর কি। খঁ্যাদার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই সে আপন মনে পাঠ বলিতে লাগিল ও শেষ পর্য্যন্ত সীতার বেণী সংহার করিয়া তবে ছাড়িল। অভিনয় শেষ হইল। এদিকে অপরেশ যখন দেখিল খঁ্যাদার ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তাহার অতি কষ্টে অর্জ্জিত গৌরব টুকু ধুলিসাৎ হইতে চলিয়াছে অভিমানে তাহার চোখে জল আসিল সাজঘরের পেছন দিয়া সে পলায়ন করিল। ছিঃ ছিঃ লোককে আর সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

দর্শকবৃন্দ খঁ্যাদারামকে ডাকিয়া কহিলেন কৈ হে তোমাদের লেখক কোথায়? তিনি কোন্ রামায়ণের অনুকরণে নাটক রচনা করলেন শুনি? তিনি নিজেই নূতন কবি বাল্মীকি হইলেন? খঁ্যাদা দুঃখের সাথে জানাইল অপরেশ উধাও হইয়াছে! সেই অবধি অপরেশের নাম হইল নূতন কবি বাল্মীকি। দেখে সেই বলে নূতন কবি বাল্মীকি। অপরেশ লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারে না। আর সর্ব্বনেশে খঁ্যাদা মুখ পোড়া খঁ্যাদা, সর্ব্ব নিন্দার হাত হইতে রেহাই পাইল।

চার

সেদিন বিকাল বেলা অপরেশ একা একা নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল। যাত্রা গানের পর সে আর খঁ্যাদার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু খঁ্যাদা নাছোড় বান্দা সে আর ছাড়িবে কেন? খঁ্যাদা অপরেশের খোঁজে নদীতীরে গিয়াই হাজির হইল। খঁ্যাদা কহিল—"কিরে বড় যে হুতোম মুখো হয়ে ঘুরছিস্?

বেহায়াটার কথা বলিতে কী একটু ও লজ্জা করে না? অপরেশের সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরিয়া যায়। সে কোন উত্তর দেয় না। খঁ্যাদা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে ব্যাপার কি?

অপরেশ ঝাঁকাইয়া উঠিল এবং বলিল, "ব্যাপার আমার মাথা। বাঁদর—লিখতে পারিস—কবিত্ব করতে পারিস আর পরিচয় দিতে পারিস না। বলতে পারলিনে সীতা হরণে ভীমকে ঢুকিয়েছি আমি অপরেশ নয়।"

খঁ্যাদা অনুতপ্ত হইয়া বলিল—"দুঃ ছাই আমি ওকি অত শত বুঝেছিলাম। পাঠ হলেই হল। সেখানে ভীম রাবণে প্রভেদ আছে কি? তা না হতভাগা দর্শকগুলো যেই দেখেছে ভীম অমনি হোঃ হোঃ হোঃ" অপরেশ বলিল—"আমি তখন একশো বার বললুম ভীম দিয়ে কাজ নেই—তা না ও জোড় করেই ভীম ঢুকালো! আবার ভয় দেখাল ভীম না হলে পাঠই করবেন না। সেনা আমার প্লেয়ার। খঁ্যাদা বলিল, "দেখিস্ এবার আর আমার কিছু ভুল হবে না।"

অপরেশ বলিল, "হ্যাঁ আরও তোকে নিয়ে যাত্রা করছি না! খেয়ে তো আমার আর কাজ নেই। বেটা হনুমান। হনুমান হলেও মানাতো।"

"হনু মানের কথা তখনও তো বললে পারতি?"

অপরেশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"তাই বা বলতে যাব কেন? রাবনই কম কিসে শুনি!"

খ্যাঁদা অনুতপ্ত হইয়া কহিল—"তখন কি অতটা জ্ঞান ছিল। ভীমের পাঠ আমার মগজে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। অন্য কিছু সেঁধোচ্ছিল না।"

—"যাক যা হবার হয়ে গেছে। এখন ভাল করে একটি বই লেখ দিকিন?" অপরেশ সম্মত হইল।

পাঁচ

'তাইরে নাইরে' তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে সন্ধ্যার পর খ্যাঁদা গিয়া বাড়ী উপস্থিত হইল। সে দেখিল গৃহের সম্মুখে তাহার বাবা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খ্যাঁদার বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটি সজোরে লাফাইয়া উঠিল। খ্যাঁদার বাবা কলিকাতায় চাকুরী করেন। বৎসরে দু'তিনবার দেশে আসেন ও দিন কয়েক থাকিয়া পুনরায় চলিয়া যান। এই দিন কয়েকটি খ্যাঁদার বিপদের দিন। সারাক্ষণ ভাল ছেলে সাজিয়া বাড়ী বসিয়া থাকিতে হইবে। সকাল ও বিকাল বেলা বাবা কান ধরিয়া পড়াইতে বসাইবে। খ্যাঁদার নিকট সংসারে বাবা বলিয়া একটি জীব যেন উৎপাৎ বিশেষ। সে বেড়ায় ডালে ডালে এই যন্ত্রণা তাহার সহ্যাতীত। সুতরাং দ্বারে পিতাকে দেখিয়া খ্যাঁদা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। চুপটি করিয়া বাবার পাশ কাটাইয়া সে ঘরে ঢুকিল। দেখিল মা কি সব বাঁধাছাদা করিতেছেন। খ্যাঁদা আশ্চর্য্য হইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি মা ?

"কাল যে আমরা যাব।" মা উত্তর দিলেন।

"কোথায় ?" বিস্ময়ে খ্যাঁদা অবাক।

"কল্‌কাতায়।"

"কেন মা ?"

খ্যাঁদার প্রশ্নের ধরন সত্যিই কৌতুকময় মা না হাসিয়া পারিলেন না। বলিলেন "তোর জন্যে।"

"কেন আমি কি করলুম ?"

"তুই সারাদিন ঘুরে বেড়াস লেখা পড়া করিস্‌নে তাই।" যদিও তাহার জন্য তাহাদের কলিকাতা যাইতে হইতেছে সে

কথা মোটেই সত্য নয়। মহিমবাবু কলিকাতায় চাকুরী করেন। এতদিন বাসা অভাবে স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতে পারেন নাই। সম্প্রতি হোটেলে খাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া একটি বাসা ভাড়া করিয়াছেন। পাঁচ দিনের ছুটি লইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

খ্যাঁদার মনটি অত্যন্ত বেশী খারাপ হইয়া গেল। সে ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়। এবার থেকে কোঠায় বন্ধ হইতে হইবে। স্কুলে যাইতে হইবে। সারাদিন টো টো করিয়া আর ঘুরিয়া বেড়ান সম্ভব হইবে না। আর তাইরে নাইরে সুর ভাঁজা চলিবে না। শ্যেন দৃষ্টি এড়াইয়া স্কুল পালানও শক্ত হইবে না। স্কুল না নরক কুণ্ড। স্কুলের নামেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। এই স্কুলে সে যখন প্রথম ভর্ত্তি হইয়াছিল নূতন ও অচেনাছাত্রদের মধ্যে তাহার প্রথম প্রথম কি অসুবিধাই হইয়াছিল তাহা একমাত্র সেই জানে। কত করিয়া কত দিনে তবে ছাত্রদের সাথে আলাপ জমাইয়াছে। এখন সকলে একান্ত পরিচিত। হায়রে অদৃষ্ট আবার কোথায় যাইয়া পড়িতে হইবে কে জানে। আবার ছাত্রদের সহিত পরিচয় করিতে কত দিন লাগিবে? সেখানে 'এমনি চৌধুরীদের পুস্করনী, এমনি নদী, আম, জাম, নারিকেল, গাছ ও মুক্ত মাঠ পাইবে কিনা কে জানে?

সর্ব্বোপরি দুঃখ অপরেশের সহিত আর খেলা ধূলা হইবে না। অপরেশ ব্যতীত সে কেমন করিয়া দিন কাটাইবে। খ্যাঁদা মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যা মা কল্‌কাতায় এমন নদী আছে না?"

"নাই।"

"নাই!" খ্যাঁদা এমনি ভঙ্গী করিয়া উঠিল যে, মা দেখিয়া আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। "খুব মুস্কিল হচ্ছে না! নদীতে ঝাঁপিয়ে নাইতে পাবি না। আমরাও তো তাই চাই। তুই যে দুষ্টু ছেলে এবার শান্ত হয়ে যাবি।"

"গাছ-গাছালি মাঠ, পুকুর ওসব কিছু নেই?"

"না। সময়ে অসময়ে আর দৌড়ুতে হবে না গাড়ী চাপা পড়বি।"

"গাড়ী চাপা! সে আবার কি?" খঁ্যাদা চমকিয়া উঠিল। সেকি মা কেমন গাড়ী? ওরা আমায় চাপা দেবে কেন?"

মা রহস্য করিয়া বলিলেন—"দুষ্টু ছেলেদের চাপা দিতেই ওরা রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

খঁ্যাদার আর কিছু বলিবার থাকিল না। তাহার দুঃখের কথা কে বুঝিবে? যেখানে স্বয়ং মা বাবাই তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছেন। শুধু একজন তাহার এই মনো বেদনা বুঝিতে পারে সে হইতেছে অপরেশ। খঁ্যাদার ছট্‌পট্‌ করিতে লাগিল, এখনি ছুটিয়া গিয়া অপরেশকে সকল দুঃখের কাহিনী জানায়। কিন্তু এখন সবে মাত্র রাত হইয়াছে। ভোর হইবে তবে দাঁতন ঘষিতে ঘষিতে সে অপরেশদের পুষ্করণীর ধারে গিয়া উপস্থিত হইবে। এই মাঠ, এই নদী, এই আম, জাম, নারিকেল গাছ এই ভানু এই টুনি উহাদের ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? নষ্ট চন্দ্রের রাতের কথা মনে পড়িয়া কলিকাতা হইতে যে তাহার প্রাণ ছট্‌পট্‌ করিবে! খঁ্যাদা আর ভাবিতে পারে না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে বিষণ্ণ চিত্তে শয্যা গ্রহণ করিল।

ছয়

কোকিল ডাকিল কুহু। কাক ডাকিল কা। রাত ভোর হইল। খ্যাঁদা শয্যা ত্যাগ করিল। বাহিরে আসিয়া একখানি মলিটার ডাল ভাঙ্গিয়া দাঁতন ঘষিতে ঘষিতে অপরেশদের পুষ্করণীর ধারে রওনা হইল। অপরেশ পুষ্করণীর ধারে বসিয়া রহিয়াছে। জলে হাঁসগুলি সাঁতার কাটিতেছে। পাশের ফুল বাগিচায় মৌমাছিরা গুঞ্জরণ তুলিয়াছে। প্রজাপতিরা উড়িয়া ফুলের বুকে বসিতেছে। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা ফুলের পাপড়িগুলি হইতে শিশির বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই শিশির বিন্দুর শব্দ যেন মনে এক পবিত্র ভাব আনিয়া দেয়।

খ্যাঁদা পিছন হইতে অপরেশকে ডাকিল। অপরেশ ফিরিয়া তাকাইল।

"কিরে?"

ভগ্ন কণ্ঠে খ্যাঁদা বলিল "আজ আমরা চলে যাব। খ্যাঁদার চোখে মুখে বিষণ্ণ ভাব।"

"কোথায়?"

"কলকাতায়।"

"কেন? কখনও আর ফিরবিনে?"

ব্যথিত কণ্ঠে খ্যাঁদা উত্তর দিল—"জানিনে ভাই। অপরেশের মনখানি বড় কাঁচা হইয়া গেল।

"আজ সে ভোরে উঠিয়াই ভাবিতেছিল কেমন করিয়া আর একটি নাটক লিখিয়া সে খ্যাঁদার সহিত যাত্রা গান করিবে। খ্যাঁদা না থাকিলে যে তাহার কিছুই হইবে না। মনে পড়িল কাল বিকেলে সে খ্যাঁদাকে ভৎসনা করিয়াছে। ভারি অনুতাপ হইল খ্যাঁদার হাত ধরিয়া বলিল "কাল বকেছি রাগ করিস্‌নে ভাই?"

খ্যাঁদা উত্তর দিল "তোর যে কথা—রাগ করব আমি, কিন্তু তুই যাবি আমি কি করব?"

একটু ম্লান হাসিয়া খ্যাঁদা উত্তর দিল, "কেন যাত্রা গান।"

"আমি আর কক্ষনো যাত্রা গাব না।"

খ্যাঁদা বলিল, "আচ্ছা ভাই আমার কাছে চিঠি দিস্?"

অপরেশ সম্মতি জানাইল।

"তুইও দিস্?"

"দেব।"

সাত

অপরেশ আর খ্যাঁদাকে পত্র দিয়াছিল কিনা সে খবর আমরা রাখি না। কিন্তু তাহারপর যখন অপরেশের সঙ্গে দেখা হইল সে তখন কিশোর। বন্ধু বিচ্ছেদের ব্যাথায় তাহাকে ম্লান করিয়াছে সে কথা মনেও হইল না। আর বিচ্ছেদ ব্যথা সে মানুষের মনে কতদিনই বা থাকে। যখন আসে, জীবনের সমস্ত আকাশটাকে শ্রাবণের ঘন কালো মেঘের মতই আছন্ন রাখিয়া আবার সে আপনিই চলিয়া যায়। শরতের নীল আকাশ আবার স্মিত হাসি হাসিতে থাকে। ইহাদের দুই বন্ধুর জীবন ক্ষেত্রেও উহার ব্যাতিক্রম হয় নাই। পশ্চাতের দিনগুলির সুখ দুঃখ যাহার জীবনে বর্তমানের সাথে সমপর্য্যায় চলিতে থাকে, পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের লোক। কিন্তু এমন লোক খুব কমই নজরে পড়ে। মানুষ সম্মুখে যে অবলম্বন পায় তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই পরাশ্রিতা লতার মত পশ্চাতের দিনগুলি বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়। ইহা যে ভগবানের মায়া ; তাহা না হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র রক্ষা পায় কোথায় ! অতীতের দিনগুলি মানুষের জীবনে চির অনাগতের মতন পড়িয়া থাকে। পেছনের মাঠখানা থাকে কুয়াশাবৃত হয়ে অনেক দূরে। মানুষের ভুলক্রমে সে কুয়াশা জমে উঠে গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হয়।

তারিণী ঠাকুর্দ্দা গ্রামের একজন শিক্ষিত প্রাচীন ব্যক্তি। আজ কয়েক বৎসর সপরিবারে আসামে কাটাইয়া আজ কয় দিন হইল গ্রামে ফিরিয়াছেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে অপরেশের কবিত্ব কাহিনী শুনিতে পাইলেন। সকলে যাহা কবিত্ব বলিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয় তিনি তাহা পারিলেন না। উপহারাদি কয়েক খানি

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতায় তিনি অপরেশের কবি-প্রতিভা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন চেষ্টা করিলে হয়তো তাহাকে মানুষ করা যাইতে পারে,, তাই তিনি একদিন নিজে আসিয়া অপরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

প্রকৃতির দৃশ্যানন্দে বিভোর হইয়া অপরেশ তখন কল্পনা জগতে বিচরণ করিতেছিল। তারিনী ঠাকুর্দ্দা আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অপরেশ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ হইলে সাধারণতই মানুষের একটু গাম্ভীর্য আসে ও সহজে সম্মানার্হ হয়। গাম্ভীর্য্যের গণ্ডি একটা ব্যবধানের রেখা টানিয়া তাহাকে সকলের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। সেই গাম্ভীর্য্য কিন্তু তারিণী ঠাকুর্দ্দার যেন একটু কম মাত্রায় ছিল। তবুও তাঁহাকে দেখিলে আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ঠাকুর্দ্দা অপরেশকে বলিলেন, "শুনলুম তুমি নাকি কবি হয়েছ?"

অপরেশ লজ্জায় বদন নত করিল।

"দেখাও দেখি তোমার ছু'একখানা কবিতা?"

অপরেশ একটু লজ্জিত—মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল—"আমি কবিতা লিখি আপনাকে কে বলেছে?"

"সেকি কাউকে বলতে হয়। প্রতিভা এমনি জিনিষ যা আপনিই প্রকাশ পায়। যাক সে কথা—দেখাও দেখি তোমার কবিতা।"

অপরেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "কবি হ'চ্ছ, লজ্জা করলে চলবে কেন? আর কবিতা সে তো সাধরণের দেখবার জন্যেই। নাও বের কর দেখি! অপরেশ সঙ্কোচিত চিত্তে একখানি খাতা ঠাকুরর্দ্দার দিকে বাড়াইয়া দিল।

উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা "যুগ-বহ্নি" : লেখক শ্রীঅপরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুর্দ্দা প্রথম পাতা উল্টাইলেন লেখা, 'প্রার্থনা'।

মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেন। কবিতার প্রতিটি ছন্দ, ভাব তাঁহাকে বিস্মিত না করিয়া পারিল না। বাহিরে তিনি যে কল্পনা করিয়াছিলেন। দেখিলেন, প্রকৃতি কবি তাহারও অনেক ঊর্দ্ধে বিচরণ করিতেছে। কিছুক্ষণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া ঠাকুর্দ্দা অপরেশের দিকে তাকাইলেন বলিলেন, "বা বেশ লিখ্‌তে পারতো! যাক্ তোমার লেখা নিয়ে আলোচনা করব পরে, এখন এস অন্য বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্ কেমন?"

"কি নিয়ে?"

"ধর বর্ত্তমান কাল নিয়ে।"

"রাজ নীতি?"

"না। রাজনীতি নিয়ে বললে যে তুমি বুঝবে না এমন নয়। তবে আমি আলোচনা করতে চাই আমাদের নিয়েই।"

"তুমি তো গ্রামে থাক,—কিন্তু কি কি অভাব আজ পর্যন্ত বোধ করেছ?"

"অভাব সব দিকেই।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "না অপরেশ অভাব সকল দিকে নয়। এটা তোমার শেখা বুলি। অভাব কয়েকটি বিশেষ দিক থেকে। এই ধর শিক্ষা। শিক্ষায় তোমারা অনেক দূর পিছিয়ে রয়েছ গ্রামের অধিকাংশ লোক মূর্খ। অথচ শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নেই। তোমরা যে কয়জন স্কুলে পড় তোমাদের জ্ঞান একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বুঝলে। লেখাপড়া করছ অথচ স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্যস্তরের শিক্ষা এখনও পাওনি।"

"খানকতক বাঁধা ধরা বই পড়েই কি প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া যায়? প্রকৃত শিক্ষিত হতে হলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিত্য সমন্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়।"

"কিন্তু কি উপায়ে? প্রথমেই বল্‌তে পার একটি রেডিও। পেটে ভাত জোটে না রেডিও কিন্‌বে কে? তবু প্রত্যহ নিশ্চয়ই

সংবাদ পত্র পাঠ করতে পারি। আমি আজ কয়েক বৎসর গ্রামে ছিলাম না। ইচ্ছা ছিল, আমার পল্লীকে আদর্শ পল্লীকরে গড়ে তুলব। তোমরা তখন ছোট ছিলে, হয়তো জানতে পার প্রত্যেক দিন আমার বাড়ীতে খবরের কাগজ আসত। সংবাদ পত্রের উপকারকে কোন দিনই আমি তুচ্ছ ভাবতে পারিনি। প্রগতির সার্থক বাহক সংবাদ পত্র। বহিবিশ্বের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ রাখতে পারে সহরের ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের অপেক্ষা চতুর হয় বেশী। দ্বিতীয়ত শিক্ষার ব্যবস্থা হল আলোচনা। আলোচনা করে যতদূর শিক্ষা লাভ করা যায়, সারা জীবন পুঁথি-পুস্তক পড়েও তা হয় না।

তোমাদের একটি আলোচনা সভা গড়ে তোলা নিতান্ত প্রয়োজন। সপ্তাহে একবার সভার অধিবেশন হবে। গ্রামের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যাক্তিরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আলোচনা হবে দেশ বিদেশের নানা কথা,—রাজনীতি,—সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নিয়ে। তোমাদের মধ্যে কেউ বা গল্প, কেউ কবিতা, কেউ বা প্রবন্ধ শিল্প পাঠ করে শোনাবে। কেউ বা বক্তৃতা দেবে তোমাদের যা ভুল ক্রুটি সংশোধন করবেন গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিরা।"

অপরেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "এ খুব চমৎকার আইডিয়া আপনার।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "এ আমার আইডিয়া নয় প্রত্যেক সুসভ্য স্বাধীন দেশেরই এই রীতি। তুমি আমি সেই রীতি থেকে বঞ্চিত বলেই এত অসহায়, বিশ্বের সভ্য জাতিরা আমাদের ভাবে মূর্খ, ঘৃণ্য।"

অপরেশ বলিল "এতে আমার খুব সম্মতি আছে। কিন্তু অন্য ছেলেদের আমার বিশ্বাস হয় না।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "তাদেরও যাতে বিশ্বাস আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর দেখ এই যে গ্রামের চাষী সম্প্রদায় ওরা কেবল চাষ করে আর শস্য কেটেই দিন কাটায়।"

হাত পাওয়ালা মানুষ হয়েও শিক্ষার অভাবে পশুতুল্য। তাই ওদের সমাজ আজ পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ! ঘরে ঘরে আজ ব্যভিচারের স্রোত। ওদের জাগাতে হবে। হয়তো মনে করবে ওদের শিক্ষা দিয়ে লাভের চাইতে ক্ষতির পরিমাণই বেশী। ওরা শিক্ষিত হলে কি আর চাষ করিতে চাইবে? তখন হাল ছেড়ে সহরে গিয়ে ধন্না দেবে চাকরীর জন্য। কিন্তু এ আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। আমরা শিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিনা তাই।

ওদের শিক্ষার অভাব যে আমাদেরই সমূহ ক্ষাতৎ আমরা সে কথা অনুভব করতে পারি না। ভেবে দেখ, ওরা শিক্ষিত হলে কি বেশী শস্য উৎপাদন করিতে পারবে না।

আর শিক্ষিত হলে ওরা যদি হাল না বাহিতে চায়। ক্ষতি কি? আমরাই চাইব। কিন্তু ওরা যদি প্রকৃত শিক্ষিত হয় তখন হাল ছেড়ে কখনও আর চাকুরীতে ঢুকতে চাইবে না। হাল বাওয়ার স্বাধীনতা চাকুরীর মোহকে তুচ্ছ করে দেবে। যে কোন প্রকারে হোক ওদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ওরা শিক্ষিত হলে তবেই গ্রামের শ্রীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। নতুন নয়। আর দেখ তোমাদের কর্ম্ম ক্ষমতার অভাবে গ্রামখানিতো গ্রাম নয়, যেন পশুদের নিবাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো বল্‌বে সরকার যদি গ্রামের প্রতি নজর না দেন তবে আমরা কি করতে পারি? এক্ষেত্রে আমি বলব এমন গ্রামের প্রতি সরকার দৃষ্টিপাত করবেনও না, করা উচিতও নয়। 'তোমাদের যুবকদের নিজেদেরই নিতে হবে পল্লী সংস্কারের ভার।"

অপরেশ বলিল, "আমরা যদি তেমন প্রয়াস করি, আমাদের সাহায্য করবে না। বরং মনে কর্‌বে আমাদের কোন মতলব আছে—'সত্যি লোকে তা বলবে জানি। তাইতো আর ও বেশী করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ওদের নিন্দেয় আমাদের সঙ্কোচিত হলে চলবে কেন? ওরা ওদের ভাল বোঝে না। তাই

বলে আমরাও বুঝব না। ত্যাগ আর ধৈর্য্য নিয়েই দেশের সেবা করা চলে। অসত্য চিরদিন থাকে না একদিন তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবি। সত্য উদ্ঘাটিত হবেই। আর সেই দিন লোকে আমাদের চিনবে। তুমি হয়তো ভাবছ ঠাকুর্দ্দা কি যা-তা বক্‌ছেন না ?”

“না ঠাকুর্দ্দা আমি অমন কখনো ভাবিনি আর ভাবওনা আমি আর আপ্রাণ আপনার উপদেশ রাখতে চেষ্টা করিব।”

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন “সত্যি তুমি হয়তো বললে বিশ্বাস করবে না আমি তোমায় দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। প্রথম যখন গ্রামে এসে লোক মুখে তোমার কথা শুনতে পেলুম তখন তো বিশ্বাসই হয়নি। সেদিনের এক রত্তি ছেলে সে আর কি হবে! কিন্তু তারপর যখন তোমার দু’একখানী কবিতা পড়লুম, বুঝলুম তোমার প্রতিভা রয়েছে তাই নিজেই এলুম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আশা করি ভবিষ্যতে তুমি একজন আদর্শ মানুষ হয়ে আমাদের গ্রামের মুখ উজ্জল করবে। এখন তবে আসি। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যেও ?”

“অবশ্য। এবং বারবার গিয়ে বিরক্ত করব, আপনি তো রাগ করবেন্ না ?”

ঠাকুর্দ্দা হাসিয়া বলিলেন, “নিশ্চয়ই খুব রাগ করব। তাই বলে তুমি যেন ভয়ে পিছিয়ে যেও না।”

ঠাকুর্দ্দা চলিয়া গেলেন। অপরেশ খানিকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর কি ভাবিয়া কোলের কাছে খাতাখানি টানিয়া আনিয়া লিখতে লাগিল। ঠাকুদ্দা তাহার উৎসাহকে শত গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।

আট

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে অপরেশ পাঠাগারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। অপর্ণা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অপরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে অপা ?"

"একটি কবিতা লিখে দাও দাদা।"

"কবিতা দিয়ে কি হবেরে ?"

"কাল যে আমাদের স্কুলে জমিদার নারায়ণবাবু আসবেন। শান্তা দিদি সবাইকে বলে দিলেন যারা লিখতে পার জমিদারবাবুর আগমন উপলক্ষ্যে কবিতা লিখে এনো। যার কবিতা ভাল হবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।" যাক্, তুমি দেরী কোরনা ? আমায় চট্ করে একটা কবিতা লিখে দাও দিকিনি।"

"তা আমি লিখে দেব কেন ?"

"ওসব কিছু শুনতে চাই না। লিখবে কিনা লেখ। অপর্ণা নিজেই খাতা কলম আনিয়া অপরেশের নিকট রাখিল।"

"তাহলে না লিখে অব্যাহতি নেই ? তাই না খাতা কলম নিয়ে এলুম !"

অপরেশ একটু মৃদু হাসিয়া খাতা কলম টানিয়া লইয়া বসিতে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার কবিতা লেখা হইয়া গেল। লেখা শেষে একবার সে নিজেই মনে মনে কবিতাটি আবৃত্তি করিল। তারপর অপর্ণার হাতে দিয়া কহিল—"নে দেখ দিকিন হল কিনা ?" অপর্ণা খাতার পাতায় চোখ বুলাইয়া সদ্য লিখিত দাদার কবিতা খানি পড়িতে পড়িতে যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, সেই প্রথম পুরস্কার পাইবে। তাহার দাদার চাইতে এতল্লাটে কে আর ভাল কবিতা লিখিতে পারে! অপরেশ

প্রশ্ন করিল "আচ্ছা অপা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কবিতাটি কে দিয়াছে, কি বলবি ?"

"কেন বলব আমি লিখেছি।"

"মিথ্যে বলবি ?"

"মিথ্যে আবার কি! দেখো সবাই কাউকে না কাউকে দিয়ে লিখিয়ে আনবে। ওদের আবার কবিতা লিখবার ক্ষমতা আছে না।"

"যদি তোর কবিতার চাইতে অন্য কারও কবিতা ভাল হয় ?" অর্পনা দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত জবাব দিল, "তা হতেই পারে না। এ দেশে তখন কবিই নেই। তবে বিদেশ থেকে ভাড়া করে আনতে হবে।"

অপরেশ একটু মৃদু হাসিল। সেকি গৌরবের না অর্পনার ছেলে মানুষিতে তাহা ঠিক্ বোঝা গেল না।

......তারিণী ঠাকুর্দ্দা ভাবিতেছিলেন ভবিষ্যতের অপরেশের কথা। যখন ও বড় হইয়া কবি বলিয়া খ্যাত হইবে তখন উহার নামের সহিত তাঁহার গ্রামটিও কি গৌরবান্বিতা হইয়া উঠিবে না! এমনি অজস্র এলোমেলো চিন্তাধারা তাঁহার মস্তকে বহিতেছিল। তিনি অফুরন্ত কল্পনার স্রোতে আপনা হইতেই ভাসিয়া যাইতে-ছিলেন। নাতিনী মিনতি আসিয়া তাঁহার চিন্তা ধারায় বাঁধা সৃষ্টি করিল। মিনতির বয়স এগার বার বৎসর হইবে। ঠাকুর্দ্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে মিনু ?"

"একটি কবিতা লিখে দাও দাদু!"

"কেন কবিতা দিয়ে কি হবে? কিসের কবিতা ?"

"কাল আমাদের স্কুলে জমিদার নারায়ণবাবু আস্‌বেন সেই উপলক্ষে শান্তা দিদি সবাইকে বলে দিলেন কিছু লিখে নিয়ে যেতে। যার লেখা সবচেয়ে ভাল হবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "বেশতো লেখ।"

"আমি নই তুমি লিখে দাও।"

"তোমার কবিতা আমি লিখব কেন?"

"তবে আমি কি লিখতে জানি!"

"না জান নেবে না। তাই বলে পরের লেখা নিয়ে নিজে নাম করবে?"

মিনতি অবাক্ হইয়া বলিল, "বারে তুমি আবার পর কোথায়? ওসব কিছু শুনতে চাইনে। লিখে দাও।"

"সবার ক্ষমতায় কি আর কবিতা লেখা কুলোয় দিদি!"

"বেশ তবে লিখিয়ে দাও?"

"কাকে দিয়ে?"

"অপরেশ দাকে!"

"ওঃ—আসল কথাই হচ্ছে ঐটি। তা এত ভনিতার প্রয়োজন ছিল কি বল?"

মিনতির সুন্দর বদনখানি রক্তিম হইয়া উঠিল। "না ঠাট্টা নয় দাদু সত্যি।"

"সত্যি যে সেত আমিও জানি।"

"যাও তুমি বড্ড পাজী। সব কথার কেবল উল্টো মানে কর। লিখিয়ে দেবে কিনা বল?"

নাতিনী ঠাকুর্দ্দার এমনি রহস্যানুষ্ঠানের মধ্যে হঠাৎ অপরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিল,—

"ঠাকুর্দ্দা!"

"কে অপরেশ! এস বস!"

মিনতি লজ্জিতা হইয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল।

ঠাকুর্দ্দা ডাকিলেন, "চলে যাচ্ছিস্ যে বড়। তাহলে কবিতার আর প্রয়োজন নেই?"

বলা বাহুল্য মিনতিকে দেখিয়া অপরেশও অপ্রতিভ হইল।

সে মুখ নত করিয়া অন্যমনস্কতার ভাব দেখাইতে লাগিল। ঠাকুর্দ্দা বলিলেন—

"অপরেশ আমায় একটি কবিতা লিখে দিতে হচ্ছে।"

অপরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল "কি কবিতা ?"

"আর বল কেন" বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরেছে। শেষ পক্ষের গিন্নীর বায়না। কবিতা চাই। জানই তো দ্বিতীয় পক্ষের আবদার না রাখলেই মহাপ্রলয়। অথচ কবিতা তার চাইই।"

"অতএব এই বিপদে তোমার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর দেখছিনা।"

মিনতি অপরেশের অলক্ষ্যে দাদুকে তর্জ্জনীদ্বারা শাসন করিল।

ঠাকুর্দ্দা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "দেখ্‌লে, দেখ্‌লে অপরেশ। শাসনের নমুনাখানি একবার দেখলে ? দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এমনই হয় বটে ?"

অপরেশ একটু মৃদু হাসিয়া বলিল "কিসের কবিতা ?"

"ওদের স্কুলে নাকি কাল নারায়ণপুরের জমীদার আসবেন স্কুল পরিদর্শন করতে, সেই উপলক্ষে স্কুলে কবিতা প্রতিযোগীতা হবে। যা হোক তুমি একটা কিছু লিখে দাও তো। নাহলে আমার তিষ্ঠান দায় হবে।"

অপরেশ জমীদার মহাশয়ের নাম সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকিলেও ছল করিয়া বলিল, "কিন্তু জমীদারের নামতো জানা চাই ?"

ঠাকুর্দ্দা মিনতির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"এবার তোমার পালা।" মিনতি একটু সলজ্জ হাসি হাসিল। অপরেশ মিনতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "নাম শুনি" ? মিনতি আরক্ত মুখে উত্তর দিল, "নারায়ন বাবু।"

তার পর একটু লজ্জা করিয়া পুনরায় কহিল—"তবে কাল দেখেন ?"

অপরেশ বলিল, "কাল কেন, এখনি নাও না।" মিনতি নীরব রহিল। অপরেশ মিনতির নিকট কাগজ কলম চাহিল। মিনতি তড়িৎ বেগে গৃহের অপর কোন হইতে কাগজ কলম আনিয়া দিল। অপরেশ লিখিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে অপরেশ সুদীর্ঘ এক কবিতা রচনা করিয়া ফেলিল। লেখা শেষ হইলে কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইল।

মিনতিকে আর পায় কে। এক নিমেষে এমন একখানি কবিতা সে কখনও আশা করেনি।

সে হাত বাড়াইয়া কবিতাটি লইল। তার পর একটু যেন কি ভাবিল। কৃতজ্ঞতা জানাইবার ইচ্ছা হইলেও পারিল না, কবিতাটি লইয়া নীরবে প্রস্থান করিল। ঠাকুর্দ্দা এক দৃষ্টে উহাদের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন, "দেখ অপরেশ, অনেক কবিই আজ পর্য্যন্ত দেখেছি, তাদের কবিতাও পড়েছি—কবি হিসেবে তারা তোমার চেয়ে অনেক বড় সন্দেহ নেই, যদিও তাদের সঙ্গে তোমার এখনও তুলনা কর্‌বার সময় আসেনি। কিন্তু তোমার মত এমন যখন তখন কাকেও ফরমাসে কবিতা লিখতে দেখিনি। সত্যি এ ভারি অদ্ভুত।"

অপরেশ নিজের প্রশংসাবাদে লজ্জিত হইয়া বলিল, "কথা থাক্। তার চেয়ে দেখুন তো!" বলিয়া একখানি কবিতার খাতা ঠাকুর্দ্দার নিকট আগাইয়া ধরিল। ঠাকুর্দ্দা খাতাটি লইয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠান্তে প্রশংসমান দৃষ্টিতে অপরেশের প্রতি তাকাইলেন। তার পর কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া তিনি অপরেশকে বলিলেন,—"শোন অপরেশ আজ তোমায় একটি সহজ উপদেশ দিচ্ছি। সব সময় কবিতা লিখবে না, অনবরত কবিতা লিখে সময় নষ্ট করবার সময় তোমার নেই। অফুরন্ত জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে তোমায় এখন আহরণ করতে হবে জ্ঞান। এখন যদি তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করে কেবল

কবিতা লিখে দিন কাটাও তোমার উন্নতি অধিক দূর হবে না। আর কেবল কবিতা লিখে মানুষকে উপদেশ দেবার চেষ্টা কোরো না। নিজে যা' পার না পরকে কখনো তেমন উপদেশ দিও না। সে কখনো কার্য্যকরী হবে না। আর এক কথা মনে রেখ এই জগৎ কর্ম্মময়। এখানে কর্ম্মকে অবহেলা করলে চলবে না, সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে।

তোমার সাহিত্যকে কর্ম্মের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই সে প্রকৃত সফল-সাহিত্য হতে পারবে।

"আমিও ছোটবেলায় কবিতা লিখতুম। একদিন সাধ্ করে একটি বইও ছাপতে গিয়েছিলুম। প্রেস ছিল এক স্কুল মাষ্টারের।"

তিনি আমায় ডেকে বললেন, "দেখ খোকা তোমার এখনও বই ছাপবার সময় হয় নি। আগে সঞ্চয় কর। ছোট বারুদের স্তূপে আগুন ধরলে ছোট শব্দ হয়। কিন্তু বড় স্তূপে আগুন ধরলে সে শব্দে পৃথিবী কম্পিত হয়। আমিও ছোট বেলা কবিতা লিখ্তুম, সাহিত্য সাধনা কর্তুম, কোথায় গেল সব? কর্ম্ম জগতে যখন এসে দাঁড়ালুম সংসারের প্রচণ্ড ধাক্কায় সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল কোথায়? মনে রেখ সংসারের ধাক্কা অতি প্রচণ্ড। জীবনে তুমি সে আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে থেক। কর্ম্ম সাগরে পড়ে যেন কূল হারিও না। সাহিত্য যে কর্ম্মেরই একটা অঙ্গ সে কথাটা ভুলে যেও না। কাকেও বাদ দিলে চলবে না, তবে আদর্শ মানবের কর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হবে, জীবনে নানা আঘাত আসবে। অসহ্য সে আঘাতে তোমার হৃদয় গলে যাবে। ব্যথায় তবু যেন ভেঙ্গে পড়ো না। চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে কোটর থেকে—তবু যেন এক ফোঁটা অশ্রু না পড়ে।

হয়তো তোমার মাথায় চাপ্‌বে এমনি ভার, সে যেন হিমালয়ের চাপ্—তুমি ভাঙ্গবে তবু নত হবে না। এই যে জীবনের একটা

"বিপদ বিপ্লব যদি একবার সইয়ে নিতে পার, দেখবে সাফল্য এসে আপনি তোমার গলায় পরিয়ে দেবে তার জয় মাল্য।"

ঠাকুর্দ্দার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় অপরেশের মস্তক আপনিই নত হইয়া আসিল।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "বয়সের একটা ধর্ম্ম আছে অপরেশ। তুমি এখন যে কবিতাটি আমায় দেখালে সেটা তোমার বয়সের ধর্ম্মানুযায়ী লেখা হয়নি। সুতরাং তেমন মধুরও হয়নি। জীবনের সুখ দুঃখের সমাবেশ তুমি এখনি কি লিখ্‌বে। আমার মনেহয় তুমি আজ যে কবিতাটি লিখেছ তা' তোমাকে কষ্ট করে লিখ্‌তে হয়েছে। তুমি যা লিখতে চাচ্ছ তা' তোমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। শোন, যখন বালক ছিলাম পৃথিবী ছিল খেলার, কৈশোরে হল শ্যামল, যৌবনে দেখি সে অতি উজ্জ্বল, আর আজ পশ্চিমাকাশের গায় অস্তগামি সূর্য্যের বিদায়ী রশ্মীমালা মেঘে মেঘে অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে।"

একবার সেইদিকে ফিরিয়া তাকাও, দেখিবে উদাসী সন্ধ্যার অপূর্ব্ব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে আকাশের গায়।

তাহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর্দ্দার জীবনে এমনি স্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যা আসিয়াছে। ঠাকুর্দ্দা অকুল সাগরের কিনারায় দাঁড়াইয়া আছেন, আর বিশুদ্ধ সাগর পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ তুলিযা গর্জ্জন করিতেছে। বাতাস বহিতেছে শোঁ-ওঁ-ওঁ।

বার্দ্ধক্যে দেখি চতুর্দ্দিকে সন্ধ্যার মলিনতা।.........ঠাকুর্দ্দা যেন আবেগ ভরে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। একে একে তাঁহার জীবন ভরা সঞ্চিত সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলি অপরেশের নিকট ব্যক্ত করিয়া যাইতে লাগিলেন।

মুগ্ধ অপরেশ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশামৃত পান করিতে লাগিল।

নয়

রাত্রিতে পড়িবার ঘরে অপরেশ অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোদের স্কুলে আজ জমীদারবাবু এসেছিলেন? কবিতা পাঠ হল?"

গম্ভীর মুখে অপর্ণা উত্তর দিল—হুঁ।

"মুখ যে বড় ভার ভার দেখছি?"

অপর্ণা যেন একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—"ভার আবার কি?"

"কার কবিতা প্রথম হল?"

মুগ্ধ চিত্তে অপণা জানাইল,—মিনতির। অপর্ণা অভিমানে দাদাকে তিরস্কার করিয়া কহিল,—"তুমি আর কবিতা লিখো না দাদা! ঐ মিনতির সাথে পার না তুমি আবার কবি!"

অপরেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা তোর কবিতা কি হল?"

"সেকেণ্ড।"

"কি পুরস্কার পেলি?"

"ছোটদের রবীন্দ্রনাথ।"

অপরেশ অপর্ণাকে বলিল,—"মিনতির কবিতা প্রথম হয়েছে, সেকি নিজে লিখেছে?"

অপর্ণা ক্রুদ্ধা হইয়া উত্তর দিল—'তবে কি সাতজন দিয়ে লিখিয়ে এনেছে? লজ্জা থাকলে আর কবিতা লিখো না। মেয়ে ছেলের সঙ্গে পার না—তার আবার কবি।'

অপরেশ প্রশ্ন করিল—"কেন মেয়ে ছেলে কি আর মানুষ নয়?"

থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে। মিনতি তো রাস্তায় আসতে আসতে বলল কিরে অপা ঘরে কবি থাকতে যে বড় হেরে গেলি?"

"তুই কি বললি?"

"কি আর বলব চুপ করে রইলুম।"

"বল্‌লিনে তোরটিই বা কে লিখে দিয়েছে শুনি?"

হতাশ কণ্ঠে অপর্ণা উত্তর দিল—"বলতে কি আর বাকী রেখেছি!"

"ওকি বললো?"

"বলল, আমি নিজেই লিখেছি। আমি কি আর কবিতা লিখতে জানিনা! কবি বুঝি শুধু তোর দাদাই? মুখ পোড়া মেয়ে! রাগে আমার গা রি-রি করে উঠল। কিন্তু কি করব! কি ছাই মাথা মুণ্ডু লিখে দিলে—"

অপরেশ উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল।

"হাস্‌ছ যে বড়! তোমার যে কেন লজ্জা করে না—তাই ভাবি।"

অপরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল—"মিনতির জয় যে আমারই জয় হয়েছে।"

"ছাই হয়েছে। অর্পণা ঝাঁপাইয়া উত্তর দিল।"

সে অপরেশের কথাটি তলাইয়া ভাবে নাই। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল দাদা এই কথা কেন বলল।

বুঝিল মিনতিকে দাদাই লিখিয়া দিয়া থাকিবে। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমিই বুঝি ওকে লিখে দিয়েছ?"

অপরেশ উত্তর না দিয়া নীরবে মুস্কি মুস্কি হাসিতে লাগিল। অপর্ণা বলিল, "তুমি চোর। নিজের বোনকে ছোট করে পরের মেয়েকে বড় করা।"

অপরেশ বলিল—"থাক্ আমার কিছুই মিছে হয়নি—একটি প্রথম—আর একটি দ্বিতীয়।"

দশ

কয়দিন যাবৎ ঠাকুর্দ্দা গ্রামে ছিলেন না। অদ্য বাড়ী ফিরিয়াই সর্ব্বপ্রথম অপরেশের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সারাটি বাড়ীতে যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। নীরব নিথর গৃহ। কোন সাড়া শব্দ নাই। অপরেশ অপর্ণা কাহারও চপল কণ্ঠস্বরে গৃহ আলোড়িত হইতেছে না। খবর লইয়া ঠাকুর্দ্দা জানিতে পারিলেন আজ কয়দিন হইল অপরেশের মাতৃ বিয়োগ হইয়াছে। ঠাকুর্দ্দা মনে ব্যথা পাইলেন। তিনি অপরেশকে বাস্তবিকই খুব স্নেহ করেন। এই অকপট বালকটি কি এক স্নেহের বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তাই সদ্য মাতৃ বিয়োগ ব্যাথাতুর বাক-কবির বেদনা যেন তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিল। ভাবিলেন অপরেশকে নানা প্রসঙ্গে এই বেদনার স্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। হঠাৎ পরহিতৈষি ঠাকুর্দ্দার মনে পড়িল অপর্ণার কথা। ঠাকুর্দ্দা লোকটি বড়ই অদ্ভুত ধরণের। পরের দুঃখে তিনি এমন অভিভূত হইয়া পড়েন যে অন্যে তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। নিজের দুঃখে এ পর্যন্ত কেহ তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখে নাই। অথচ পাড়ায় কাহারো অসুখ হইয়াছে জানিতে পারিলে তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। যিনি রোগ ভোগ করিতেছেন তাহার অপেক্ষা শত গুণ হইয়া ঠাকুর্দ্দার বুকে বাজে। কেহ ডাকুক না ডাকুক রোগীর পার্শ্বে গিয়া তাহাকে দাঁড়াইতেই হইবে। ঠাকুর্দ্দা ভাবিলেন ঐ এক রত্তি মেয়ে অপর্ণা সে কেমন করিয়া দিন কাটাইবে। নিজেদের মাঝে রাখিয়া না হয় অপরেশের দুঃখ লাঘব করিবেন। "কিন্তু ঐ অসহায়া মেয়েটি? তিনি জিতেন বাবুকে ডাকিয়া

বলিলেন, "তোমরা না হয় দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে কোনরকমে দুঃখটা লাঘব করবে কিন্তু ঐ একরত্তি মেয়েটার কথা ভেবেছ কেউ ? ওর এসময় একজন সাথীর নিতান্ত প্রয়োজন।"

জিতেনবাবু বলিলেন—"আমিও সেই কথা ভাবছিলাম।" ঠাকুর্দ্দা বলিলেন—"আমি বলি আমাদের মিনতি এসে কয়দিন তোমাদের এখানে থাকুক। ওরা দুজনে সমবয়সী তদুপরি (ক্লাস-ফ্রেণ্ড)—সহপাঠিনী। ওতে ওর অনেকটা দুঃখের লাঘব হবে।" জিতেনবাবু বলিলেন, "সেত অতি উত্তম কথা। তাহলে আজ বিকেলেই আমি ওকে গিয়ে নিয়ে আসব !"

হইলও তাই। সেদিন বিকেলে জিতেনবাবু নিজে গিয়া মিনতিকে লইয়া আসিলেন।

...তখন সন্ধ্যা। ধরণীর বুকে আঁধারের প্রথম পোঁচ আসিয়া লাগিয়াছে। রান্না ঘরের ধুঁয়ার মতন ওপারের গ্রামটায় একটু খানি কুয়াশা পড়িয়াছে। কুয়াশার উপর দিয়া বাঁশ ঝাড় মাথা তুলিয়া এপারের গ্রামের দিকে তাকাইয়া আছে। এক ঝাঁক পাখী মৌন হইয়া এদিকে উড়িয়া আসিতেছে। পর্দার বুকে চলচ্চিত্রের ছবির ন্যায় সন্ধ্যা তারাটি ফুটিয়া উঠিল। বাগিচার অর্ধ নিমিলীত ফুলগুলি নীরব। চতুর্দ্দিকে একটা ম্লান ছায়া। অপরেশ স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে। অপর্ণা আসিয়া তাহার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া গেল। অপরেশের প্রাণখানি হাহাকার করিতেছে। মা থাকিতে কোন দিনই বাড়ী-খানি এমন ভাবে খাঁ খাঁ করিত না। মা যেন একাই গৃহটি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অপরেশের মনে হইতে লাগিল যাহার মা নাই, তাহার কিছুই নাই। আজ সে ব্যাথায় কাঁদিলেও স্নেহ আসিয়া নয়নের জল মুছাইবে না। অপরে দয়া দেখাইতে পারে ! হয়তো অনুগ্রহ মিশ্রিত সেবা করিতে পারে। বিপদের দিনে পার্শ্বে আসিয়া সহানুভূতি দেখাইতে পারে কিন্তু অন্তরের স্পর্শ

আর পাওয়া যাইবে না। মায়ের বিরক্তির মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন স্নেহ লুকাইত থাকে। তার শাসনের মাঝেও যে একটা আন্তরিক টান থাকে, চিরদিনের তরে আর তাহা পাওয়া যাইবে না। অপরেশের নয়ন ভরিয়া জল আসিল।

...অপর্ণাকে একা পাইয়া ব্যাথা স্তূপীকৃত হইয়া বসিয়াছিল ওর মনে। বেচারী মাতৃ বিয়োগ কাতরা অপর্ণা, তাহার দুঃখে কাহার না দুঃখ হয়! ...জিতেনবাবু সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিলেন, "মা অপা দেখ কে এসেছে? অপর্ণা কৌতুহলে দ্রুতপদে ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল মিনতি। তড়িৎ বেগে ছুটিয়া আসিয়া সে মিনতির হাত ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে আপনার ঘরে লইয়া গেল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল "কিরে মিনু হঠাৎ যে?"

"কি আবার, এলাম তোদের এখানে!"

"কারণ না থাকলে কক্ষনো তুই আসিস্ নি?"

মিনতি একটু রহস্য করিয়া উত্তর দিল, "এলুম তোর ভাইয়ের কবিতা শুনতে।"

অপণার মনটি অনেক হাল্কা হইয়া গেল।

"আমার ভাইয়ের কবিতা যে তোমার প্রয়োজন নেই সেত সেদিন স্কুলেই জান্‌তে পেরেছি।"

"তাহলে তোর কবিতা তোর দাদা লিখে দিয়েছিলেন?"

অপর্ণা বিদ্রুপ করিয়া কহিল—"আর তোমারটিই বা কোন কৃষ্ণ ঠাকুর লিখে দিয়েছিলেন শুনি?"

মিনতির মুখখানি রক্তাভ হইয়া উঠিল। পুনরায় নিমেষে মুখে হাসি টানিয়া বলিল—

"আমার কবিতা আমি নিজেই লিখেছি!"

আড়চোখে অপর্ণা কহিল "সব শুনেছি!" সে আরও কি বলি[illegible]তেছিল হঠাৎ মিনতি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "চুপ্।"

"কেন ?"

"শুনতে পাচ্ছিস্ না।"

অপর্ণা কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, দাদার পড়িবার ঘর হইতে সুমধুর সঙ্গিত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। মিনতি বলিল "বা, বেশ গান তো।"

"কিন্তু ও ঘরে তো দাদা থাকে। দাদাতো গান গাইতে জানে না! কে গাইছে ?"

"চল্‌না এগিয়ে দেখে আসি।"

"চল্‌।"

উভয়ে অপরেশের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল। কিন্তু কৈ আর গান শোনা যাইতেছে না। অপর্ণা ও মিনতি গৃহভ্যান্তরে প্রবেশ করিল। অপরেশ ঠিক যেন ধ্যানে ছিল, উহাদের পদশব্দে চমকিয়া উঠিল। মিনতিকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল "গান গাচ্ছিল কে দাদা ?"

অপরেশ যেন লজ্জিত হইল। ইতস্তত: করিয়া বলিল— "কৈ নাতো!"

"এই যে শুন্‌লুম।"

এতক্ষণ মিনতির দৃষ্টি গিয়া পড়িয়াছে অপরেশের খোলা খাতাটির উপর। দেখিল, যে গানটি উহারা শুনিয়াছে সেই গানটিই এখানে লেখা রহিয়াছে। গানের নীচে লেখা—"অধম অপরেশ।" মিনতির বুঝিতে বাকি রহিল না গানটি কে গাহিয়াছে। মিনতি বলিল,—আমি কিন্তু বল্‌তে পারি গানটি কে গেয়েছে!

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "বল্‌তো ?"

"যে লিখেছে।"

অপর্ণা উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। "এখন যে কে লিখেছে তাকে খুঁজে বার করি তবে না।"

মিনতি গানের খাতাটি টানিয়া আনিয়া অর্পনাকে দেখাইল।

"এত দূরেও তোর দৃষ্টি যায়?" বলিয়া অপর্ণা মিনতির দিকে কটাক্ষপাত করিল। "আর যাবেই বা না কেন। কবির দৃষ্টি কবিতাতেই থাকে।"

মিনতি কুণ্ঠিতা হইল। অপরেশ নিজেকে বিব্রত বোধ করিল। হঠাৎ একি নব জীবনের শিহরণ আসিল অপরেশ বুঝিতে পারে না। মন শুধু জানিতে চাহিতেছে মিনতি কেন আসিয়াছে কিন্তু কি সঙ্কোচ। মিনতি নামটি মুখে আনিতে তাহার বাঁধিতেছে কেন? অপরেশ ভাবিল অর্পণাকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু করি করি করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল না। অপর্ণা মিনতিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। অপরেশের জীবন-স্রোত হঠাৎ ঘুরিয়া গেল। যে জীবন আনন্দের জগৎ হইতে অকস্মাৎ এক আঘাতে দুঃখের অতল সাগরে আসিয়া পড়িয়াছিল আজ সে আবার কোন পথে যাইতে চাহে? অপরেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া জীবনের পরম মুহূর্তে বিলীন হইয়া গেল—যখন মনে পড়ল 'মা'। তাহার আঁখিদ্বয় সিক্ত হইয়া উঠিল। মুক্তা বিন্দুর ন্যায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ডদ্বয় বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। অপরেশ মায়ের চিন্তায় বিভোর হইল। কতক্ষণ এমনি ভাবে ধ্যানে ছিল তাহা সে জানে না। ধ্যান ভাঙ্গিল অপর্ণার আগমনে। অপরেশ মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল অপর্ণার পেছনে এখনও মিনতি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিস্মিত হইল। কিন্তু এক অকারণ লজ্জায় মুখ ফুটিয়া অপর্ণাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। আবার নব জীবনে শিহরণ আসিল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "বলতো দাদা মিনতি কেন এসেছে?"

অপরেশের বুকখানি কাঁপিয়া উঠিল। সে ত উহাই জানতে চাহে! বলিল, "কেন?"

"এসেছে তোমার কাছে কবিতা লেখা শিখতে। আমাদের এখানে থাকবে কয়দিন।"

অপরেশ লজ্জিত হইল। হৃদয় এক অজানা পুলক শিহরণে কাঁপিয়া উঠিল। কিছু বলিতে গেলে কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া গেল। তবুও সময়োচিত রহস্য করিতে ছাড়িল না। বলিল, 'কেন কবি হিসেবে মিনতি যে তোর দাদার চাইতে অনেক বড় সে প্রমাণ তো স্কুলেই পেয়েছিস্।

অপর্ণা বলিল, "তাইতো ওকে বললুম, মানে ও আমায় বললে কিনা তোর দাদা লিখে দিয়েছেন?"

আমিও উত্তর দিলুম "তোরটিই বা কোন শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর লিখে দিয়েছেন শুনি?" মিনতি ভারি লজ্জা পাইল। তাহার সুন্দর মুখ-খানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। অপরেশের একখানি খাতা টানিয়া লইয়া উহা মেলিয়া ধরিয়া তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল যেন গভীর মনোযোগের সহিত সে খাতাখানি পড়িতেছে। কিন্তু উহাতে সে যে এত কি গভীর রসের আস্বাদান পাইল তাহা একমাত্র সেই বলিতে পারে। এতক্ষণে অপরেশের লজ্জা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে। মিনতিকে লক্ষ করিয়া এই প্রথম কহিল,—

"কি দেখছ মিনতি?"

মিনতি কোন উত্তর দিল না। শুধু লজ্জায় মরিয়া মুখখানি আরও নত করিল।

"আমার খাতায় তেমন কিছু নেই যা অত মনোযোগের সঙ্গে পড়া যেতে পারে।"

অপর্ণা বলিল "তোমার কবিতা নাকি ওর কাছে খুব ভাল লাগে।"

মিনতি অপর্ণার প্রতি শাসনের দৃষ্টিতে তাকাইল।

"বলেছি তোর কাছে!"

"তাহলে বল্ ভাল লাগে না!"

ইহাতে মিনতি আরও লজ্জিত হইল—বলিল, "তুই চুপ কর যা করতে এসেছিলি তাই কর!"

অপরেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে অপা ?"

"খেতে চল।"

অপরেশ যেন অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া বলিল, "ওঁঃ—তাই ?" তাহার কথার ভঙ্গিতে মনে হইল সে যেন অন্য কিছু আশা করিয়াছিল।

মিনতি একবার সলজ্জ মুখখানি তুলিয়া ধরিল অপরেশের দিকে। মুহূর্তে উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইল। মিনতি মুখ নত করিল।

এগার

দ্বিপ্রহরে অপরেশ আপন কক্ষে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। তাহার জীবন সাগরে নূতন কল্লোল আসিয়াছে। বাল্যের অপরেশ সেই কিশোর কবি অপরেশ, কোথায় চলিয়া গিয়াছে সেই দিন। দিন চলিয়া যায় আর ফিরিয়া আসে না। তাহার জীবনে আসিয়াছে এক নূতন অধ্যায়। কৈশোর যৌবনের দ্বন্দ্বে তাহার জীবনাকাশে উঠিয়াছে মিনতি ধ্রুবতারা। কেন অপরেশ বুঝিতে পারে না মিনতি তাহার হৃদয়খানি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।......

মিনতি অপর্ণাকে খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ অপরেশের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বুঝিতে পারে না কেমন করিয়া সে এখানে আসিল। অপর্ণাকে খুঁজিতে সে এখানে আসিবে কেন? অবাধ্য চরনদ্বয় তাহার অজ্ঞাতসারেই এইদিকে কখন প্রসারিত হইয়াছে। যখন আসিয়া পড়িয়াছে তখন চলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না। মিনতি গিয়া অপরেশের টেবিলের নিকট দাঁড়াইল। অপরেশের একখানি খাতা তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

অপরেশের বুকে তখন তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। বুকে সহস্র কথা যেন একসঙ্গে ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। কিন্তু কণ্ঠ কহিতে পারিতেছে না, অবশেষে কহিল—"আচ্ছা মিনতি গ্রামের লোকে আমায় কবি বলে, সত্যি কি আমি তাই?"

মিনতীর বুকের রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর দিল—"লোকে যখন বলে তাই।"

"লোকের কথা তো বলছি না, তুমি কি বল?"

মিনতীর বাক্ রুদ্ধ হইল। এখানে সে কি বলিতে পারে। "কৈ বললে না?"

আরক্ত বদনে মিনতি উত্তর দিল—“কবিতা যখন লেখেন তখন কবি বৈকি।”

“কবি জীবন খুব আনন্দের, না মিনতি?”

“মনে তো হয় তাই। আনন্দই তো কবির কাম্য বস্তু। এ জগৎ তাদের নিকট আনন্দ ধাম। তাই তো আত্মহারা কবি আকণ্ঠ পান করেন জগতের সৌন্দর্য্য সুধা।”

“তা সত্যি মিনতি। কিন্তু এই সুধাই,—কবির ভুলেই হোক্ আর তার প্রকৃতিতেই হোক, পৃথিবীর কবির নিকট অনেক সময় গরল উঠে। লোকে বলে আনন্দ জগতের জীব ইহল কবি, কিন্তু আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয় সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বেদনা দিয়েই গড়া কবিদের জীবন।

হয়তো যখন সে ধ্যানে থাকে ক্ষণিক আনন্দ পায়। নইলে এ জগৎ তার কাছে বুঝি বেদনাময়। কল্পনার রাজ্যে সে সুখী; সেখানে সে রাজাধিরাজ; কিন্তু মানুষে মানুষে যেখানে কাজ কারবার সেই বাস্তব রাজ্যে সে অসুখী। কবির মনের তৃপ্তি কোন দিনই নেই। অনেকে যাকে উপেক্ষা করে চলে যায় কবি তাকেই আঁকড়ে ধরে একান্ত গভীর ভাবে। আজ চলে গেলে কাল যাকে নিয়ে লোকে আর মাথা ঘামায় না,—কবি সেই হতভাগ্য চলে যাওয়া দিনটিকেই আপন মনে ভাবতে থাকে আরও বেশী করে। এমন কি বর্ত্তমানের স্পর্শকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়ে। বর্ত্তমানের সাথে অতীতের ঘটনাগুলিও কবির কাছে সমপর্য্যায়ে ঠাঁই বলেই সে দুঃখী। কবি কল্পনা করে সুখের, ফল হয় দুঃখের। জীবনে শুধু তার দেখা দেয় সমস্যাই। বুঝি সমস্যার তরী বেয়েই তাকে চলে যেতে হয়। নয়তো এত দুঃখ এত আঘাতের পরও এ সমস্যা কেন দেখা দেবে আমার জীবনে।”

মিনতি বদন নত করিয়াই প্রশ্ন করিল, “কিসের সমস্যা?” অপরেশ শত চেষ্টা করিয়াও তাহা আর বলিতে পারিল না।

শুধু বলিল, "জীবনে যদি কারও কথাই আমার মনে না থাক্‌তো আমি সুখী হতুম।"

"কেন?"

"পরিচয় যদি শুধু···ব্যথাই দেয় তবে সে পরিচয়ে প্রয়োজন?"

মিনতি নীরব রহিল।

আচ্ছা মিনতি,—চিরদিন কি এই কবিকে তোমার মনে থাকবে? নিশ্চয়ই না। যখন পড়বে বড় বড় কবিদের কাব্য, শুন্‌বে তাদের গান, হয়তো গ্রাম্য কবির কথা মনে করে হাসবে না? কখনো যে একই ঘরে দুটি প্রাণী দাঁড়িয়ে কোন দিন কথা বলেছিলুম, মনে করতে ঘৃণায় কুণ্ঠিত হয়ে উঠবে, না?

মিনতি নিরুত্তরে নত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে মিনতি কহিল, "আজ চলে যাব!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অপর্ণার ব্যথা ভরাক্রান্ত মনখানিকে হাল্কা করিবার জন্যই মিনতিকে আনা হইয়াছিল। কারণ সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের আত্মিয় বলিতে নিকটে কেহই ছিল না। আজ কয়েক দিন হইল অপর্ণার এক দূর সম্পর্কীয়া দিদিমা আসিয়াছেন সুতরাং মিনতির প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। অপরেশের হৃদ্‌পিণ্ডটি যেন লাফাইয়া উঠিল: চলে গেলে তো আর কাউকে ধরে রাখা যায় না।

কথাটি যেন মিনতির অন্তঃস্থল স্পর্শ করিল। সে কিছু বলিল না। অপরেশই পুনরায় বলিল—

"আচ্ছা মিনতি আমার সেই কবিতাটি কি করেছ?"

"কোন্ কবিতা? মিনতি ডাগর চোখ দুইটি মেলিয়া অপরেশের দিকে তাকাইল।"

"সেই যে জমিদারবাবুর আগমন উপলক্ষ্যে লিখে দিয়েছিলুম!"

"রেখে দিয়েছি।"

পুনরায় খানিকক্ষণ গৃহটি নীরব হইল। উভয়েই বাক্‌হীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় মিনতি কহিল, "তবে আসি?"

অপরেশ কিছু বলিতে পারিল না। বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে তাহার যেন কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এই সোনার প্রতিমাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে থাক্, সে চিরদিনই থাক্। অপরেশের হৃদয় আলোকিত করিয়া সে চিরদিনই থাক্। হায়রে অবুঝ কবি! ক্ষণিক বিদায় দিতে এত কাতর হইতেছ,—অলক্ষ্যে বিধাতা তোমার জন্য কি যে করিতেছেন—তাহা একবার দেখিলে বোধ হয় তোমার ঐ রক্ত মাংসের হৃদ্‌পিণ্ডটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইত।

মিনতি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। অপরেশ হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহাকে ডাকিল! মিনতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অপরেশের দিকে তাকাইল। দুইটি সরল আঁখির দৃষ্টিতে যেন মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিল। অপরেশ বহু কষ্টে হৃদয়ের যে ভাষা কণ্ঠে আনিয়াছিল, বলিতে পারিল না। ক্ষণিক উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইল। কিছু বলা হইল না। মিনতি চলিয়া গেল।

বারো

অপরেশ মিনতির গমন পথে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ভাবিল আবার মিনতিকে ডাকে। ডাকিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। প্রাণ যে কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। দুদিনের পরিচয়ে কে ঐ রহস্যময়ী সব চাইতে আপনার হইল? জীবনের বহুদিনের সাথীদের বিদায় তো প্রাণে এমন করিয়া দাগ কাটিতে পারে নাই। তাহার হৃদয় মিনতির জন্য যেমন ব্যাকুল হইয়াছে, মিনতির কি তেমন হয় নাই? অপরেশ বার বার আপনার মনকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। এমন প্রশ্ন প্রেমিকের পক্ষে স্বাভাবিক। সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। এই রহস্যময়ী মেয়েটির সম্বন্ধে যতই চিন্তা করা যায়, ততই যেন ভাবিতে ইচ্ছা করে। কি মধুর নামটি "মিনতি"। অপরেশের প্রাণ ভরিয়া ঐ নামটি বার বার উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু একি সঙ্কোচ? একি ভয়? একি লজ্জা? বুঝি কেউ শুনে। বুঝি কেউ বুঝে যে অপরেশ তাহাকে চিন্তা করিতেছে। মিনতি নামটি উচ্চারণ করিতে কেন যেন অপরাধীর মতন প্রাণখানি কাঁপিয়া উঠে। কাহারও মুখে ঐ নাম শুনিলে বুকখানি দুরু দুরু করিতে থাকে! অপরেশ চতুর্দ্দিকে একবার ভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল কেউ কোথায় আছে কিনা, তারপর সঙ্কোচিত অথচ অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করিল 'মিনতি, 'গিনতি'।

ঠিক তৎমূহূর্ত্তে এক কিশোর যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কিশোরও নয়, যুবকও নয়—কৈশোরের দ্বার দেশ অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র পা বাড়াইয়াছে যৌবনের দ্বারদেশে। যৌবনের চিহ্ন তাহার সর্ব্ব-দেহে পরিস্ফুট। মুখখানায় একটু দুষ্টু দুষ্টু ভাব। যুবকটি

গৃহে প্রবেশ করিয়াই অপরেশের "মিনতি" এই কথাটি শুনতে পাইল। নবাগন্তুক উহা শ্রবণ করিয়া বলিল—

"মিনতি আমার পেছনে ফিরিয়া তাকাও বন্ধু!"
উদাসীন কেন ওহে পূর্ণ কবিতা সিন্ধু?

অপরেশ চমকিয়া পেছন ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিল না। যুবকটি বলিল—

"কাব্য চর্চ্চা হচ্ছিল বুঝি?"

অপরেশ মস্তক চুলকাইতে লাগিল। আগন্তুক বলিল—

"তুমি চিনলে না মোরে, আমিও কবিতার জাহাজ,
যাত্রার দলে ভীমের পাঠে, পাঠ বলা মোর কাজ।"

বলাবাহুল্য অপরেশের মন তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

সে এই অদ্ভুত আগন্তুকের কবিতা বা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

অপরেশ বলিল—"আপনাকে?"

আগন্তুক উত্তর দিল—"আপনাকে বড় ভাব (তাই) ভুলিয়া যাও সব, কবিতা শিখিয়া ভারি বেড়েছে গৌরব।"

অপরেশ বলিল,—"না সত্যি আমি······"

আগন্তুক বলিল—

না না সত্যি আমি ঢং দেখতে নারি,
খ্যাঁদারে খ্যাঁদারে খ্যাঁদা চলে যাই বাড়ী।

এই বার অপরেশের চৈতন্য সম্পাদন হইল।

"ওঃ—খ্যাঁদা! তাইতো বলি—তা এত বড় হয়েছিস কেমন করে চিনব?"

খ্যাঁদা বলিল, "আর তুই বুঝি ছোটটি রয়েছিস! তোকে কেমন করে চিনেছি? তাই আবার মিনতি করতে শিখেছিস! অপরেশের বদন খানি রাঙা হইয়া উঠিল। কি জানি খ্যাঁদা কি সকল জানিতে পারিয়াছে? কিন্তু পুনরায় সে মুখে হাসি টানিয়া আনিল। যেন

পুরাতন বন্ধুর আবির্ভাবে সে আনন্দে অভিভূত হইয়াছে। অপরেশ হাসিয়া বলিল "খুব দেখি কবি হয়েছিস ?" আগে জানলে লিখে রাখতুম।

"এতেই এই রকম! কবিতার শুনেছিস্ কি! লিখ্‌বি তো বল এক্ষুনি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি! আমি কি আর তোদের মতন কবি যে খাতা পেন্সিল নিয়ে বসতে হবে? আমার মুখে মুখেই অজস্র কবিতা হয়ে যায়। আর গদ্য বলতে একরকম ভুলেই গেছি।"

"গদ্য বলা একেবারে ভুলে গেছি ভাই,
রসহীন গদ্য নিয়ে কে খাটে আর ছাই,
কবিতার হয়েছি আমি বর পুত্র,
কে আর মুখস্ত করে ব্যাকরণের সুত্র।
পণ্ডিত মশাই প্রশ্ন করলে উত্তর দিই পদ্যে।
বুক পকেটে পুরে রাখি সুক্ষং গদ্যে।"

অপরেশ উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। থাক্ থাক্ হয়েছে কবি-পূঙ্গব এখন একটু চুপ করুনতো। একটু গদ্যেই কথা বলুন।

'কি বল্‌লি গদ্য বললে বাঁচি—
তার আগে শুনি তুই হয়েছিস্ কোন ব্যাঙ্গাচি?'

অপরেশ হাত জোড় করিয়া বলিল—"দোহাই তোর এখন একটু থাম্ নইলে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পেটের নাড়ি ভূড়ি বেরিয়ে যাবে।"

—"দোহাই তোর যদি কবিতা বলতে হয ভীমের পাঠে বলিস্। এখন একটু গদ্যেই কথা বল।"

খ্যাঁদা হাসিয়া বলিল,—"এখনও তোর ভীমের পাঠ মনে আছে?"

"কেন থাক্‌বে না?"

এক নিমেষে উভয় বন্ধুর অন্তরের গাঢ় মিলন হইয়া গেল। তাহারা নানা প্রকার আলোচনা করিতে লাগিল। উভয় বন্ধুর

কথোপকোথন চলিতেছে এমন সময় অপর্ণা আসিয়া সেখানে প্রবেশ করিল। হঠাৎ দাদার সমবয়সী ছেলেটিকে দেখিয়া লজ্জায় আড়াল হইতে গেল। তাহার আগমন খ্যাদার দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রশ্ন করিল—"কিরে অপা কেমন আছিস? চিনতে পারলি আমায়?"

অপর্ণাকে অপরেশের মনে অতটা অবাক হইতে হইল না। কথা বলার ভঙ্গীতেই সে খ্যাঁদাকে বেশ চিনিতে পারিল।

সে বলিল, "কেন চিন্‌ব না?"

"বলতো আমি কে?"

—বারে খ্যাঁদ্‌দা, তাই চিনব না!

"কিন্তু অপরেশের চিনতে অনেক সময় লেগেছিল।"

"যা হোক্ বড্ড বড় হয়েছিস্? তোকে দেখে কেমন যেন লজ্জা লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বল্‌তে পারি আমি যদি খ্যাঁদা না হয়ে অন্য কেউ হতুম—তবে লজ্জায় কথাই বল্‌তে পারতুম না। সে যাক্—বুদ্ধি টুদ্ধি কিছু হয়েছে তো? এখনও অপরা গান গাইলে মার কাছে গিয়ে বুঝি নালিশ করা হয়? অপর্ণা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—

"মা থাক্‌লে করতুম,—কিন্তু"

"মানে?"

"এইতো কয়দিন তিনি চলেগেছেন্।"

"কি হয়েছিল?"

"জ্বর।"

"শুধ্ জ্বর?"

"হ্যাঁ।"

খ্যাঁদা বিমর্ষ হইল।

কিন্তু অপর্ণা বলিল,—

"যাক্ সে কথা—তারপর জেঠিমা জেঠা মশাই কেমন আছেন? ভাল তো?"

খ্যাঁদা বলিল, "এই ছাখতো তোর কত বুদ্ধি। অথচ—এতক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করছি একবারও একথাটি—জিজ্ঞেস করুক! বলতো খাতির কি তোর সঙ্গে—না—ওর সঙ্গে ? আছেন কোন প্রকার!"

—শহরে থেকে গ্রামের কথা বুঝি একে ভুলেই গিয়েছিলে? খ্যাঁদা যেন অবাক হইয়া উত্তর দিল—"বলে ফিরে!" গ্রামের কথা কখনও ভোলা যায়! আর গ্রাম ছাড়া খ্যাঁদার আছেই কি? সেই অমাবশ্যা রাত্রের শশা আর কলা চুরি। বাগ্‌দী বুড়ীর বকুনী, গ্রীষ্মের অসহ্য গরম, কাঁচা আমের টক্—দেখ্ বল্‌তেই আমার জিবে লাল গড়াচ্ছে।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—"শুধু এর জন্যই বুঝি তোমার গাঁয়ের কথা মনে পড়তো?"

"তাছাড়া আর গাঁয়ের মাধুর্য্য আছে কি বল্? ছেলেপিলের দল জুটে এই সব অপকর্ম্মের অবতারণা করেই না প্রকৃত গাঁয়ের সুখ উপভোগ করা যায়। তবে অপরেশের কথাটিও বারে বারে মনে পড়তো—। আর ভীমের পাঠের জন্যে প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

অপর্ণা বলিল,—"লোকে গ্রামের সুখ বলতে বুঝায় মধুর চাঁদিনী রাতকে,—দক্ষিণা মলয় হাওয়াকে, শরতের হাসিকে, বাগিচার ফুলকে, সবুজ মাঠের ঢেউকে, পাখীর গান্‌কে, আরও কত কিছু। আর তুমি কিনা অমাবস্যার রাত, গ্রীষ্মের দুপুর, আর চুরি! লোকের কাছে একথা আর বল না।"

অপরেশ বলিল—"ও চরিত্রানুরূপ কথাই বলেছে বটে।"

খ্যাঁদা বলিল—"সত্যি। অপর্ণার দৃশ্য বর্ণনা—সে ত সম্পূর্ণ কাব্য লোকের! সে না হয় পারিস তুই, আর অপর্ণা কবির বোন বলে। কিন্তু আমি? আমি তো আর কবি নই। যদিও কবিরা ভাবে সবাই বুঝি ইচ্ছে করলে কবিতা লিখতে পারে। অপরেশ

বলিল, "কবিতা লিখ্‌তে না পারলেও চিন্তা অবশ্য সবাই করে থাকে।"

"নিশ্চয়। তবে সম্পূর্ণ চরিত্রানুরূপ। যেমন তোর ভাল লাগে চাঁদ। আমার অমাবস্যার অন্ধকার। তুই যতক্ষণ কবিতা আবৃত্তি করিস্, আমি ততক্ষন আমের চাট্‌নি খেয়ে মুখ নাড়ি। তোর যতক্ষন যায় প্রেমের কল্পনা করতে, আমার যায় চুরির কথা ভাবতে। তবু দেখ আমি কিন্তু কবির বন্ধু।"

অপর্ণা হাসিয়া বলিল: "দেখ খ্যাঁদ্‌দা তোমার কিন্তু এতটুকু স্বভাব বদলেনি।"

খ্যাঁদা যেন অবাক্ হইয়া বলিল, "বলিস্ কি! স্বভাব বদলাবে কিরে? স্বভাবই যদি বদলাবে তবে এত দিন খ্যাঁদা বেঁচে থাক্‌তো কেমন করে?"

"কেন, গ্রীষ্মের জ্বলুনি, অন্ধকার রাত আর চুরি ছাড়া বুঝি তুমি বাঁচতে পার না?"

—"আমি পারি কিন্তু খ্যাঁদা পারতো না।"

"মানে?"

"অপ্‌রা ছিল খ্যাঁদার বন্ধু, আজ সে কবি। অপ্‌রা ছিল সরল সাদা সিদে আজ সে কুটিল। অপ্‌রার ছিল চোখ আজ সে অন্ধ।"

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—"বারে দাদা আবার অন্ধ হল কোত্থেকে? এইতো দাদার দুটো চোখই দেখতে পাচ্ছি। কেমন সুন্দর টানা টানা চোখ্।"

"ও দুটি কেবল বাইরেরই শোভা। ওতে কি দৃষ্টি আছে? তবে খ্যাঁদাকে চিন্‌তেও এতক্ষন লাগে? কিন্তু বলিহারি, তুই ঠিক তেমনি আছিস্। আমার খাতিরটা অপরার সঙ্গে না হয়ে হওয়া উচিৎ ছিল তোর সঙ্গে। অপরেশ বন্ধু না হয়ে বন্ধু হওয়া উচিৎ ছিল তোর।"

অপর্ণা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন, হতে দোষ কি ?"

চক্ষু বড় বড় করিয়া খ্যাঁদা বলিল "দোষ কি ?—তাহার ভাবে মনে হইল সে যেন আপর্ণার অজ্ঞতায় অবাক হইয়া গিয়াছে।"

"তোর দেখছি কাণ্ড জ্ঞান পর্যন্ত নেই।"

অপরেশ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—"বান্ধবী হতে পারতো ?" অপর্ণা বদনখানি নত করিল। খ্যাঁদা "ওহ্—" বলিয়া—স্থির দৃষ্টিতে খানিক ক্ষন অপরেশের দিকে তাকাইয়া রহিল। তার পর বলিল—"কবির মতই উত্তর দিয়েছিস্ বটে। তবে আমি সেকথা বল্‌ছিলুম না।"

অপরেশ হাসিয়া প্রশ্ন করিল তবে ?

"বা রে গাধা। ছেলে আর মেয়েতে কখন বন্ধুত্ব হতে পারে ?"

"কিন্তু মেয়ে আর ছেলেতেই খাতিরটা হয় সব চাইতে বেশী।"

"কিন্তু সে বিবাহিত জীবনে। আবিবাহিত যুবক যুবতীর নয়।"

"কিন্তু খাতিরটা কুমার কুমারীদের মধ্যেই বেশী হয়।"

"এটা হওয়া উচিত নয়।"

"এটা সমাজের ক্ষুদ্র মনের পরিচয়।"

খ্যাঁদা ঐ কুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ অররেশের প্রতি তাকাইয়া রহিল, তার পর বলিল; "ওঃ—কবি হয়েছিস্ ? তা তোদের চল্‌তে পারে ? আমাদের নয়।"

"তোদেরও চলতে পারে। তোরা আমরা কি ভিন্ন প্রাণী ?" বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় অপরেশ খ্যাঁদার দিকে তাকাইল।

"নিশ্চয়ই।"

"এটা তোদের কুসংস্কার! পর্দ্দা দিয়ে ঢেকেই কি মনের সব কালিমা দূর করা যায় ? ঘোম্‌টার অন্তরালেই গলদ থাকে সব চাইতে বেশী।"

খ্যাঁদা বলিল—"চুপ্ কর্, চুপ কর ? খুব্ লায়েক হয়েছিস্ দেখছি ?"

"কিন্তু এটা তোদের ক্ষুদ্র মনের পরিচয় খ্যাঁদা !"

বৃহৎ মনের পরিচয়ও তো আজ পর্য্যন্ত অনেকই দেখলুম, কিন্তু তাতে বৃহৎ একটা উন্নতিও চোখে পড়েনি।

"এটা তোদের ভুল ধারণা।"

খ্যাঁদা অপরেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"ভুল ধারণা! এটা আমার ভুল ধারণা! আর মেয়ে ছেলে নিয়ে সকল কাজ কর্ম্ম বাদ দিয়ে সারাদিন হৈ-হুল্লোর করে বেড়ানোটাই বুঝি খুব ভুল ধারণা? যত সব। খ্যাঁদা যেন একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল। "তাহলে গিয়েছিস্?"

অপর্ণা বদন নত করিল। এতক্ষণ সে একমনে উহাদের বিতর্ক শ্রবণ করিতেছিল। খ্যাঁদার দৃষ্টি অপর্ণার উপর আসিয়া পড়িল—বলিল, "আরে তুই দেখছি এখনও দাঁড়িয়ে?"

লজ্জায় যেন অপর্ণা মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিল। সে প্রস্থানোদ্দ্যতা হইলে,—খ্যাঁদা ডাকিল "শোন?"

অপর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"একটু চা দিতে পারিস?"

অপর্ণা প্রস্থান করিল।

অপরেশ রহস্য করিয়া বলিল,—"সেকেলে লোক হয়েছে বড় চায়ের ভক্ত হয়েছিস্?"

"ধরে নে চায়ের প্রেমে পড়েছি, কিন্তু তুই কার প্রেমে পড়লি বলতো?"

কথাটি যেন অপরেশকে বিদ্ধ করিল। যেখানে মানুষ একটু দুর্ব্বল, সেখানে আঘাত পড়িলে স্বভাবতই সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। অপরেশ গোপন কথাটি চাপিতে গিয়া মুখের ভাবে তাহাকে আরও প্রকাশ করিয়া ফেলিল। তবু খ্যাঁদাকে ভুলাইবার ছলে কহিল,—"আমি পড়েছি কাব্যের প্রেমে।"

"তোমার কথার ভাবেই তা বোঝা যাচ্ছে। বিয়ে করিনি বলে কি বর যাত্রীও হইনি? প্রেম করিনি বলেই কি প্রেম কাকে বলে তাও বুঝিনে? কাব্যের প্রেম তোমার মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে উদাসী করে ছেড়েছে? কিন্তু সাবধান এখন খ্যাঁদা এসে পড়েছে? মনে কোন দুষ্টু বুদ্ধি জুটে থাকলে সংশোধন করে নাও। আমি যদি টের পাই নাজেহাল করে ছাড়ব!"

তেরো

সেদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর্দ্দা অপরেশদের বাটী আসিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন অপরেশের মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ মাতৃ বিয়োগই হইার কারণ। তিনি অপরেশকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন।

অপরেশের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন সে একমনে কি যেন চিন্তা করিতেছে। তাহার স্বভাব-সরল মুখখানি ম্লান।

ঠাকুর্দ্দা ডাকিলেন—"অপরেশ?"

অপরেশ যেন চমকিয়া উঠিল। বলিল: "আসুন, বসুন ঠাকুর্দ্দা!"

ঠাকুর্দ্দা বসিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, এতটুকু ছেলের কপালে কুঞ্চনের রেখা পড়িয়াছে। এই কয়টি দিনের শোক যে তাহাকে কতখানি কাতর করিয়াছে তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তাই ঐ বেদনা ভরাক্রান্ত মনকে আনন্দ দান করিবার উদ্দেশ্য এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন যাহাতে তাহার মনখানি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। ঠাকুর্দ্দা জানিতেন অপরেশের কবিতা লইয়া আলোচনা করিলে সে সবচেয়ে খুসী হয়। তাই তিনি কহিলেন "আচ্ছা অপরেশ এ কয়দিন কি কি কবিতা লিখলে দেখাও দেখি।"

"কৈ ঠাকুর্দ্দা আরতো কবিতা লিখিনি।"

"কেন?"

"ভাল লাগেনি।"

"অপরেশ! জগতে ভাল না লাগা কথাটি দুঃখ বাদীদের, তারা মূর্খের মত জীবনের সুখকে মিছেই নষ্ট করে জগতে দুঃখের সাগরে সাঁতরে বেড়ায়।

কিন্তু তুমি সে দলে যাও তা আমি আশা করিনি। এ জগৎটা যে একটা মায়া। অহরহ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েও কি তুমি তা লক্ষ্য করছ না? মাতৃ বিয়োগে তুমি মুহ্যমান হয়েছ, কিন্তু নিজের দেহে নিজের বিয়োগ লক্ষ্য করেছ কখনও? অথচ প্রতি দিনই তোমার অজ্ঞাতসারে তা ঘটে যাচ্ছে। কালকের অপরেশ সেত আজ নেই। সে কালই মরে গেছে। কিন্তু তার জন্য কোন দুঃখ পেয়েছ? মানুষের প্রহরে প্রহরে মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু সবই অগোচরে। যারা এই নিত্য সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কারো বিয়োগ আর তাদের কাতর করতে পারে না। তারাই পণ্ডিত বলে খ্যাত। মুর্খ তুমি, তাই মিছেই তুমি মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছ। আমি এ বিষয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না। শুধু মনে রেখো আঘাত যত বড়ই হোক্ তাতে ভেঙ্গে পড়া কাপুরুষের লক্ষণ। সে কথা যাক্ ডিবেটিং ক্লাবের কি করলে? ডেকেছিলে কণ্টিকে?"

অপরাধীর মত ধীরে ধীরে অপরেশ উত্তর দিল: না!

ঠাকুর্দ্দা মর্ম্মাহত হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে খঁ্যাদা ডাকিল, "ওরে ব্যাঙাচী কবি ঘরে আছিস্" বলিয়া সেখানে প্রবেশ করিল। খঁ্যাদা যেন আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ ঠাকুর্দ্দার দিকে নজর পড়াতে সে থামিয়া গেল।

অপরেশ ডাকিল, "আয় বোস্ খঁ্যাদা"।

ঠাকুর্দ্দা যেন খঁ্যাদাকে দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন বুঝি এই সকল দুষ্ট ছেলের সঙ্গে মিশিয়াই অপরেশ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তিনি খঁ্যাদার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অপরেশকে বলিলেন, "আজকাল বুঝি এদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে?"

তাহার কথার ভঙ্গিতে খঁ্যাদার প্রতি এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল যে কথাটি অপরেশকে বিঁধিল! কিন্তু খঁ্যাদার তেমন কোন ভাবই দেখা গেল না।

অপরেশ বলিল, না ঠাকুর্দা আপনি যা ভাবছেন তা নয়।”

খঁ্যাদা তাহার কথায় সায় দিল।

“সত্যি ঠাকুর্দ্দা, আপনি যা ভাবছেন আমি তা নই।”

ঠাকুর্দ্দাকে তবুও প্রসন্ন দেখা গেল না। তিনি যেন খঁ্যাদাকে লক্ষ্য না করিয়াই অপরেশের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—“কিন্তু ডিবেটিং ক্লাব তেমার ডাকা প্রয়োজন।” অপরেশ বুঝিল ইচ্ছা করিয়া ঠাকুর্দ্দা খঁ্যাদাকে অপমান করিতে চাহেন। সে ঠাকুর্দ্দার কথার জবাব না দিয়া উল্টো তাঁহাকে প্রশ্ন করিল—

“কিন্তু ওর পয়িচয় তো নিলেন না ঠাকুর্দ্দা? ও খঁ্যাদা, মহিম কাকার ছেলে।”

এমন ভঙ্গীতে খঁ্যাদা অপরেশের কথার পুনরুক্তি করিল যে তাতে না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না।

“হ্যাঁ আমি খঁ্যাদা, মহিম ঘোষের ছেলে।”

অপরেশ ঠাকুর্দ্দাকে দেখাইয়া খঁ্যাদাকে প্রশ্ন করিল—“উনি কে চিনিল না তো!” খঁ্যাদা স্মরণ করতে লাগিল।

“বেণু কাকার বাবা।

“ও:—“খঁ্যাদা চট্‌পট্ উঠিয়া গিয়া ঠাকুরর্দ্দাকে প্রণাম করিল।

“থাক্, থাক হয়েছে।” শুষ্কমুখে ঠাকুর্দ্দা খঁ্যাদাকে প্রতিহত করিলেন।

অপরেশ বলিল, “ও কিন্তু একজন কবি ঠাকুর্দ্দা!”

ঠাকুর্দ্দা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলিলেন, “তাই নাকি?

“আজ্ঞে ঠাকুর্দ্দা।” খঁ্যাদা উত্তর দিল। “আমি বড় কবি আর ও ছোট কবি। এখন এক গাঁয়ে হলাম তুইকবি। তুজনের তুটো নাম চাইতো। তাই ওর সাম দিয়েছি ব্যাঙাচি কবি। কেমন ঠাকুর্দ্দা ভাল হয়নি?”

ঠাকুর্দ্দা উত্তর দিলেন, “আর তোমার নামটি বুঝি ব্যাঙ্ কবি?”

"ব্যাঙ, গাধা, ছারপোকা, উল্লুক, বিড়াল, টিকটিকি, ভোঁদড় যা বলেন।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "ধন্যবাদ। তোমার নাম রাখার একটা বাহাদুরী আছে দেখছি।"

অপরেশ বলিল, "ওর কবিতা লেখার বাহাদুরী আরও বেশী। শুনবেন?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "এখন থাক। আগে আমাদের কথা শেষ হতে দাও।—শোন।"

খ্যাঁদা মুখে অসম্ভব রকম গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিল, "বলুন।"

যেন কথাটি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল।

তাহার ভাব দেখিয়া বিরক্তি সত্ত্বেও ঠাকুর্দ্দা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"বলছতো কিন্তু রাখতে পারবে কি?"

"পারি না পারি, কথা রাখব।"

"তুই দেখি একটি অদ্ভুৎজীব। পারিস না পারিস কথা রাখবি, এ আবার কেমনতর হলরে?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "বলছিলুম একটি আলোচনা সভার কথা। অপরেশকে বলেছিলাম গ্রামের ছেলেপেদের একদিন ডেকে এক জায়গায় জড় করতে। দুঃখের বিষয় সেই কবে বলেছি কিন্তু আজ পর্যন্তও তা করতে পারেনি।"

"ওঃ এই কথা!" খ্যাঁদা এমন ভাব করিয়া উঠিল যে তাহার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল কাজটি তাহার নিকট জলবৎতরলং। সে বলিল, "একি আর ঐ ব্যাঙাচির কাজ ঠাকুর্দ্দা! আদেশ করুন শ্রীমানকে দেখবেন সব হয়ে গেছে। গ্রামের ছেলেদের একত্র করব তা আবার বলতে হবে! কাঁধে মই জুড়ে নিয়ে আসব না। সবাইকে দিয়ে কি আর সব কাজ চলে ঠাকুর্দ্দা? তবে আর দুনিয়াটা এমন থাকতো না।"

"বেশ এবার তোমারই পরাক্রমই দেখা যাক্।"

"আশীর্ব্বাদ করুন ঠাকুর্দ্দা সব মইয়ে জুড়ে নিয়ে আসব।"

"তোর দেখছি একটা আশীর্ব্বাদের বাতিক আছে।"

"হনুমানের আর রাম নাম ছাড়া কি গতি আছে বলুন।"

"নিজে কথা বলে নিজেকেই লজ্জা দিচ্ছিস?"

"লজ্জাটা অঙ্গের ভূষণ কিনা!"

"কিন্তু, তুইতো দেখছি নির্লজ্জ!"

খ্যাঁদা বলিল, "তাইতো কথায় কথায় লজ্জা খুঁজি!"………

নানা কথায় কথায় ঠাকুরদার ভ্রম ধীরে ধীরে অপনীত হইল। তিনি আপনার ভুল উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

চাপল্যের আবরণেও খ্যাঁদার আসল রূপ প্রকাশ পাইল।

চৌদ্দ

দ্বিপ্রহর। অপরেশ রাস্তায় বাহির হইল। উদ্দেশ্য ঠাকুর্দ্দাদের বাড়ী যাইবে, কারণ মিনতির সহিত দেখা করা একবার প্রয়োজন।

কিন্তু রাস্তায় বাহির গইতেই খ্যাঁদার সহিত মুখোমুখী হইয়া গেল। খ্যাঁদা বলিল, "কোথায় যাচ্ছিসরে ব্যাঙ্গাচি ?"

অপরেশ মনে মনে ভারি বিরক্তি বোধ করিল। এমত অবস্থায় সকলেরই বিরক্তি বোধ হওয়া সম্ভব। অদ্ভুত এই—বন্ধুটি। গালি দিলেও হাসিয়া কথা বলে। এড়াইয়া চলিলে গা ঘেসিয়া আসিয়া আলাপ জমায়। সুতরাং অপরেশ জানিত এক্ষণে তাহাকে নীরব থাকিলেও চলিবে না। কিন্তু কোথায় যাইবে সে কথা সত্য বলিবার সাহস এবং ইচ্ছাও তাহার নাই। [শুধু এই-স্থানে আসিয়াই মানুষ তাহার নিকটতম আত্মীয় বন্ধুকেও বিশ্বাস করিতে পারে না] অপরেশ ভাবিল যদি ঠাকুর্দার বাড়ীর কথা বলা যায় তবে খ্যাঁদা অবশ্য সঙ্গ ধরিবে। এখন খ্যাঁদা তাহার সহিত যাউক ইহা তাহার আদৌ ইচ্ছা নহে! সুতরাং বলিল, "কোথাও যাচ্ছি নাতো!

খ্যাঁদা বলিল: "নিশ্চয়ই কোথাও যাচ্ছিস, চল আমিও যাব।"

অপরেশ ভারি মুস্কিলে পড়িল,—সত্যি বলছি কোথাও যাচ্ছিনা "তবে চল্ ঠাকুর্দার বাড়ী যাই একবার।"

খ্যাঁদা অপরেশের গোপন ক্ষতটিতেই ঘা দিল। তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে যখন বুঝিল খ্যাঁদা অবশ্যই তাহার পেছন লইবে। অগত্যা তাহাকে ফাঁকী দিয়া কহিল, "তবে চল তোদের বাড়ীই যাই।"

"চল্।"

উভয়ে ধীরে ধীরে খ্যাঁদাদের বাড়ীতে গিয়া উঠিল। খ্যাঁদা অপরেশকে লইয়া বরাবর অন্দর মহলে তাহার শয়ন ঘরে আসিয়া বসিল।

খ্যাঁদদের বাড়ীতে অপর কেহই নাই। মা, বাবা, ছোটভাই-বোন সকলে কলিকাতায় থাকে। খ্যাঁদা কয়েকদিনের জন্য গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছে।

উপবেশনান্তে খ্যাঁদা অপরেশকে প্রশ্ন করিল,—"বল্‌তো দিন দিন অমন শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন?"

এই প্রশ্নটিকেই অপরেশ সবার অধিক ভয় করিত। কেহ এই প্রশ্ন করে, সদা সর্ব্বদা সে এই ভয়ে শঙ্কিত থাকিত। স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই অপরেশের মনে হইত, তাহার অন্তরের কথাও বুঝি ধরা পড়িয়াছে। অপরাধীর ন্যায় আপনিই তাহার বদন নত হইয়া আসিত।

অপরেশ ম্লান হাসিয়া উত্তর করিল,—"কৈ?"

খ্যাঁদা বলিল—কৈ বলিস্ আর যাই বলিস্ আমি বুঝি।"

অপরেশের বদন পাংশু হইল। বলিল "কি বুঝিস্?"

খ্যাঁদা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "বুঝব কি আর ছাই, তোকে দেখে দেখে এই বুঝি যে, দিন দিন তোর স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। যাক্‌গে সে কথা; কিন্তু কবিতা লিখিস্ না কেন বলত?

"পারিনা ভাই।"

খ্যাঁদা প্রশ্ন করিল: কারণ?

"কারণ আবার কি? সব কিছুরই কারণ থাকতে হবে?"

"নিশ্চয়ই কারণ ছাড়া কিছু গড়েও না ভাঙেও না।"

"বেশ তার আগে বল কি কারণে আমার কবিত্ব গড়ে উঠেছিল?"

"হয় জন্মগত কারণ নয় প্রকৃতি। কিন্তু ভাঙ্গার কারণ?

অপরেশ যেন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

খ্যাঁদা বলিল,—"লোকের জন্মগত সংস্কার সহজে ভাঙ্গেনা। সেটা ভাঙ্গতে একটা কঠিনতর আঘাতের প্রয়োজন। কিন্তু এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। কাল আমার একখানা কবিতার প্রয়োজন। ফুল সম্বন্ধে একখানা ভাল কবিতা দিবেতো।

অপরেশ হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—"কেন? কাউকে দিবি?"

"হ্যাঁ। আমার প্রেমিকাকে।"

কথাটা অপরেশকে বিদ্ধ করিল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে কথাটি বলা হইয়াছে সে কথা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। সে উত্তর দিল, "না, আমি লিখতে পারব না।"

"লিখতে পারবে না তো ব্যাঙাচী হয়েছিলি কেন শুনি?"

অপরেশ ম্লান হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা দেব।"

খ্যাঁদা যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "এইতো পথে এসেছ বাছাধন। কবিতা লেখটা বন্ধ করিস্‌নে বুঝলি! জানিস্‌ তো কেবল শক্তি থকলেই হয় না; ওটা কতকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। হেলায় ওকে ঠেলে ফেলে দিলে ভগবানের দানকে মিছেই নষ্ট করা হবে। আচ্ছা যদি তোর নাম হয়, দশজনে তোকে চেনে—তাতে ক্ষতি আছে কিছু? না সেই নামের ভাগ খ্যাঁদা কেড়ে নিতে আসবে, শুনি? হয়তো বল্‌বি বলিস্‌ কেন? ওটা আমার একটা অভ্যাস।"

অপরেশ হাসিয়া বলিল "আমার সুযশ হলে তোকে না হয় ভাগ করেই দেব।"

"সে যা দিবি জানি। তবে দেখ তোকে যে হাড়গিলে ধরেছে সেটাকে ছাড়াতে চেষ্টা করিস্‌? দিন দিন তো গঙ্গা এড়িং হচ্ছিস্‌। বাড়ীতে খেতে পাস্‌নে?"

অপরেশ হাসিয়া বলিল—"তাই বোধ হয়।"

খ্যাঁদা বলিল, "তাতো বটেই। যার বাপ সহস্রপতি, তার ছেলে তো না খেয়েই থাকবে। কিন্তু দেখ বড় লোকেরা রীতিমত খাচ্ছে দাচ্ছে তবু স্বাস্থ্য নেই। অথচ পেটপুরে দু'বেলা ভোজন করাও যাদের কষ্টসাধ্য তাদের স্বাস্থ্য অটুট। এই দেখ তুই ধনীর ছেলে গঙ্গাফড়িং, আর ঐ রামা কৈবর্ত্তব্য খেতে পায় না, পেটা সুস্থ চেহরা।

অপরেশ বলিল—"ওটা ভগবানের আশীর্ব্বাদ।"

"তাই বটে। আচ্ছা তুই একটু বোস্ আমি চা করি কেমন? চা'র অভ্যাস আছে তো? কলকাতা গিয়ে ভারি বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে ও না হলে আর চলেই না। অনেকে বলে ওটা ষ্টাইল। কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা নয়! ওটা দেশের অর্থনৈতিক অবনতির জন্যই হয়েছে। দু-আনার এক পেয়ালা চা আর এক বাটি মুড়ি সকাল বেলার বার আনার জল খাবার বাঁচিয়ে দেয়। অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয়স্বজনকে আপ্যায়িত করতে মধ্যবিত্তদের এই চা-ই সম্মান বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি বলবো এ'টা তা'দের আশীর্ব্বাদ। আচ্ছা তুই বোস্ আমি চা করছি। আবার সেই ফাঁকে উড়ে পালাস্‌নে যেন।"

খ্যাঁদা চা প্রস্তুত করিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অপরেশ এই সুযোগ! না হইলে সারা বৈকালে মুক্তি নাই। সে এই ফাঁকে পলায়ন করিল। বরাবর ঠাকুর্দ্দার বাড়ীর দিকে পা বাড়াইল। খ্যাঁদা ক্ষণকাল পরে চা, জলখাবর প্রভৃতি লইয়া আসিয়া দেখিল, অপরেশ নাই। ভারি রাগ হইল। মনে হইল এখনি গিয়া অপরেশকে কান ধরিয়া লইয়া আসে। কয়েকবরে উচ্চৈস্বরে অপরেশকে ডাকিল। কিন্তু কোন প্রতিউত্তর আসিল না। জল-খাবার ও চা বিনাযত্নে অবিন্যস্ত টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয় সে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। যে ভাবেই হোক ঐ ঠাণ্ডা চা-ই অপরেশকে সে পান করাইবে। খ্যাঁদা বারবার অপরেশদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

পনের

অপরেশ দেখিল ঠাকুর্দ্দা গৃহে নাই। সে বরাবর ঠাকুর্দ্দার ঘরে গিয়া বসিল। এ বাড়ীতে তাহার অবাধ গতিবিধি। টেবিল হইতে ঠাঁকুরর্দ্দার গীতাখানি তুলিয়া লইয়া সে উহার পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিয়া রহিল। ইহা তাহার কেবলমাত্র পড়িবার ভান, তাহার হাব ভাবেই উহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল! বইয়ের পাতায় তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার মন যে অন্য কোথাও পড়িয়া রহিয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

হঠাৎ ঘরে কাহার পদশব্দ হইল। অপরেশ কম্পিত বক্ষে চাহিয়া দেখিল মিনতি। মুহূর্ত্তে তাহার রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। বুক কাঁপিতে লাগিল। মাথা ঘুরিতে থাকিল। নিজেকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অপরেশ কহিল ঠাকুর্দ্দা কোথায়? মিনতির অনুরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছে—সন্দেহ নাই! সে রক্তিম বদনে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—এইতো বেরিয়ে গেছেন।" কাহারও মুখে আর কোন কথা নাই। উভয়ের বুকেই তখন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাতলামি চলিয়াছে। মিনতির কি হইল সে নীরবে নত বদনে সেইখানেই দাঁড়াইয়া বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। একটুও নড়িল না বা চলিয়া গেল না। তাহার ভাবে মনে হইল বুঝিবা অপরেশ তাহাকে ডাকিয়াছে, তাই সে প্রশ্নের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অজগরের সম্মুখে পড়িলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শীকারগুলি নাকি আপনা আপনিই তাহার বদন বিবরে গিয়া প্রবেশ করে। ইহাই নাকি অজগরের আকর্ষণী শক্তি। অপরেশ অজগর না হইলেও তাহার প্রাণের আকর্ষনই যে মন্ত্রমুগ্ধের মত মিনতিকে দাঁড় করাইয়াছে রাখিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপরেশের বুক কাঁপিতে লাগিল।

একবার মনে করিল লজ্জাসরম ত্যাগ করিয়া সেদিনের অসমাপ্ত কথাটি এখনই বলিবে। কিন্তু বলি বলি করিয়াও আর যেন মুখে আসিতে- চাহেনা। মিনতিই আগে কথা কহিল বলিল—"আচ্ছা অপরেশদা অপনার মন খুব খারাপ? মিনতির কণ্ঠ একটু কাঁপিয়া গেল। মুখে একঝলক রক্ত খেলিয়া গেল। বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। অপরেশ উত্তর দিল, "সত্যি মিনতি আমি হতভাগ্য।" "মিনতি যেন সান্ত্বনা দিবার ছলে বলিল, "দুঃখ করে তো লাভ নেই। মা বাবা কারও চিরকাল থাকেন না। সবারই একদিন মৃত্যু হবে।"

অপরেশ বলিল এই চিরন্তন সত্যটি সবাই বলে কিন্তু বুঝে কয়জন? জানি মা বাবা কারও চিরদিন বেঁচে থাকেন না, তাঁরা মরে সন্তানদের কষ্ট দেন। কিন্তু আমার দুঃখ কি তার জন্যেই?

—তবে?

—মৃতের বিয়োগ শোক সহ্য করা যায় মিনতি, কিন্তু যারা জীবিত থেকে তাদের চাইতে ও অধিক দুঃখ দেয়, তাদের দেওয়া দুঃখ যে সহ্য করা যায় না। বিশেষতঃ আঘাতটা যখন শত্রুদের কাছ থেকে আসে না।"

তাহার কথার ভঙ্গীতে মিনতির বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, কিন্তু সে দুঃখ কি জানতে পারি?

"বললে তুমি বিশ্বাস করবে?"

"কেন করব না!

অপরেশ ডাকিল—"মিনতি?"

মিনতি মুখ তুলিয়া তাকাইল। অপরেশ উঠিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল। মিনতির সর্ব্বদেহে প্রতি শিরায় শিরায় উষ্ণ শোনিতের স্রোত বহিল, দেহে বিদ্যুতের রোমাঞ্চ দিল। অপরেশ বলিল, "মিনতি…… সে দুঃখ দিয়াছ তুমি। তাকাও দেখি একবার আমার দিকে?

মিনতির লাজ নম্রবদন আপনা হইতেই আরও নত হইয়া পড়িল। অপরেশ চিবুক ধরিয়া বদনখানি উত্তোলিত করিল। মিনতি স্তিমিত নেত্রে তাকাইল। উভয়ের আঁখিতে মিলন হইল। মিনতির দৃষ্টি তৎক্ষনাৎ নামিয়া আসিল।

অপরেশ বলিল—"মিনতি, আমি তোমাকে ভালবাসি!" মিনতির চেতনা যেন বিলুপ্ত প্রায় হইল। সর্ব্বদেহ কাঁপিতে লাগিল। সে স্বর্গে কি মর্ত্তে বুঝিতে পারিল না।

অপরেশ প্রশ্ন করিল, "কিন্তু মিনতি তুমি কি আমায় ভালবাস না? বল···?"

মিলতি নীরব হইয়া রহিল।

"বল মিনতি, শুধু এইটুকু জানাতে আজ আমি এসেছি! আমার জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করছে শুধু তোমার ছোট একটি উত্তরের উপর। তুমি যদি শুধু মুখ ফুটে বল, তবেই আমার শান্তি।"

মিনতি তবুও নিরব হইয়াই রহিল।

"বলবে না? শুধু একটি মুখের কথা, যার উপর আমার মরণ নির্ভর করছে, তাই তুমি বলতে পার না?"

শুধু একটি মুখের কথা সত্যি বটে; কিন্তু তাহাও জীবন-মরণ সমস্যার চাইতে কম্ নয়। অনায়াসে কেহ অপরের জন্য প্রাণ দিতে পারে। প্রিয়তমা প্রিয়তমের জন্য তিলে তিলে আপনাকে ক্ষয় করিতে পারে, শুধু একটু প্রশ্নের জবাব সে মুখোমুখি দিতে দিতে পারে না।

মিনতিকে নীরব দেখিয়া যেন অপরেশ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রথমে অনুরোধ করিল। শেষে কাতর ভিক্ষা করিল। কিন্তু পাষাণ প্রতিমার মত মিনতি তবুও নীরব।

"তবুও তুমি বলবে না? তোমার হৃদয় কি পাষাণ দিয়ে গড়া?"

হয়তো বা রক্তমাংসেরই, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে পাগল প্রেমিকের প্রশ্নে-সেও পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মিনতি যেন রক্তমাংস হীন এক পাংশু মূর্ত্তি। সে নিশ্চল, নীথর, শুধু বক্ষাবরণের অন্তরালে হৃদয়খানি ধুক্ ধুক্ করিতেছিল।

অপরেশ আকুল হইয়া বলিল, "মিনতি আমার প্রশ্নের জাবাব দাও?"

অবুঝ কবি আজ প্রেমে অন্ধ। বুঝিল না, সে যাহা মুখোমুখি জানিতে চহিতেছে তাহা মিনতির বলিবার সাধ্য নাই। শুধু এ মিনতি কেন, কোন দিন কোন মিনতিই—পারে নাই। কোনদিন কোন প্রেমিকাই পারিবে না।

অপরেশ অধৈর্য্য হইয়া বলিল,—"মিনতি, বললে না কিন্তু তোমার এই নীরবতা চিরদিন আমার হৃদয়ে তুষানল হয়ে জ্বলে থাকবে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।"

অপরেশ অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আর একবার মিনতির দিকে তাকাইল। কিন্তু একি! মিনতি তাহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। তাহার নয়নে জল। অশ্রুসিক্ত আঁখিতে হৃদয়ের অব্যক্ত ভাষা অপরেশর নিকট পরিস্কার ভাবে প্রকাশ পাইল। এত সুন্দর করিয়া এই মুহূর্ত্তে শত ব্যাকুলতা সত্বেও অপরেশ তাহা বলিতে পারে নাই। তাহার ইচ্ছা হইল ফিরিয়া গিয়া মিনতিকে বক্ষে চাপিয়া ধরে। চুম্বনে চুম্বনে তাহার আরক্তিম বদনখানিকে রক্তাভ করিয়া তোলে।

মরি মরি আঁখিজলসিক্তা মহিমময়ী বদনখানি। তাহাতে সন্ধ্যার রঙীন ম্লান আভা আসিয়া ঐ মুখে পড়িয়া তাহার সৌন্দর্য্যকে শতগুণ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রেম বিহ্বলা মুখে এক স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতি। অপরেশ একদৃষ্টে তাকাইয়া সেই বদন-

ষোল

খ্যাঁদা বারবার আসিয়া অপরেশদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়াই অপাকে ডাকিল। 'যাচ্ছি' বলিয়া সাড়া দিয়া দ্রুতপদে অপর্ণা রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"কি খ্যাঁদা দা ?" তোমায় যেন খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছে ? হয়েছে কি ?

খ্যাঁদা যেন একটু রুক্ষ মেজাজেই বলিল : হবে কি আর ছাই ! বলি গুনধর ভাই রত্নটি এখানে এসেছিলেন ? বলিহারি গুণের ভাই তোর।

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তেমনি গুণের বন্ধুও পেয়েছে।"

"ঠাট্টা করছিস ? কিন্তু আমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথারে, ভাগ্যের কথা।"

"সে তো বুঝতেই পারছি। নিজের গুণপনা যখন নিজেই ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছ।"

খ্যাঁদা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—"ভারি বেহায়া মেয়েতো।" কেবল তর্ক। বেটাছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তর্ক করতে তোর লজ্জা করেনা ?

আচ্ছা মেয়েছেলের নাম ধরে চিৎকার করে ডাক্‌তে তোমার তোমার লজ্জা করে না ?"

"কেন করবে ?"

"তবে আমারই-বা কেন করবে ?"

"লজ্জাই তো মেয়েদের অঙ্গের ভূষণ।"

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—"পুরুদের বেলায়ও কি তা চলে না ?"

"না।"

"কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আমি দেখেছি যাতে অনেক বেটা-ছেলেও অনেক মেয়েছেলেদের নাম ধরে ডাকতে পারে না।"

"নেহাৎ অপরিচিত হলে ডাকবে কেমন করে ?"

"অপরিচিত তো মোটেই নয়, বরং গাঢ়তম পরিচয় বললেই হয়।"

"কি জানি বাপু। তোমাদের ভাই বোনের সবই যেন কেমন উল্টো !"

পুনরায় খ্যাঁদা বলিল, "আমার মতে লজ্জাই নীরব ভূষণ হওয়া উচিত।"

"কিন্তু আমি, বলব ওটা ঘোমটার ভেতর খ্যামটার নাচ। দেখ যারা প্রকাশ্যে অপরাধ করে, তাদের অপরাধ তত গুরুতর বা ঘৃণ্য নয়। কিন্তু যারা অন্যায় করেও তাকে ঢেকে রেখে বাইরে আপনাকে সাধু সাজিয়ে বেড়ায়, তাদের পাপ ক্ষমার অযোগ্য।"

খ্যাঁদা বলিল,—"সবইতো বুঝলুম, কিন্তু একথা বলার মানে ?" অপর্ণা একটু আগাইয়া আসিল, খ্যাঁদার দিকে কেমন একটা দুষ্টু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"মানে ?···আচ্ছা খ্যাঁদা, তুমি বয়স্থ ছেলেমেয়েদের তেমন মেলামেশা পছন্দ কর না, না ?"

"না।"

"ধর কেউ কাউকে ভালবাসে তবুও না ?"

"কি যা তা বক্‌ছিস্, আমি যাই।"

"দাঁড়াও।"

"কেন ?"

"আমার আর তোমার মেলামেশাটাও বুঝি তুমি পছন্দ কর না ?"

খ্যাঁদা একটু ভাবিয়া বলিল,—"না।"

অপর্ণা বলিল,—কিন্তু আমি যদি বলি, "আমি করি ?"

"কেন ?"

অপর্ণা নিসঙ্কোচে উত্তর দিল,—"আমি তোমাকে ভালবাসি তাই।"

খ্যাঁদা একটু দুলিয়া উঠিল। এই কথাটি কি কেবল অপর্ণারই ?

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মন ফিরাইল। না এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা খ্যাঁদাকে বিচলিত করিলে চলিবে না। মহত্তর কার্য্যের জন্য তাহার জন্ম হইয়াছে। তাহার জীবনের আদর্শ সমাজসেবা।

খ্যাঁদা বলিল,—"কি বাজে বক্‌ছিস্। আমি চললুম।" খ্যাঁদা দোরের দিকে পা বাড়াইল।

অপর্ণা ডাকিল, "শোন। খ্যাঁদা ফিরিল।

"যাকে খুঁজছ বলতে পারি সে কোথায়।"

খ্যাঁদা বদন বিকৃত করিয়া বলিল, "বলতে পার তো এত ঢং হচ্ছে কেন ?"

"তুমি ঢং ভালবাস ভাই।"

খ্যাঁদা বলিল,—"উনি আমার অন্তর্য্যামী। কি বলবি চট্‌পট্ বল ?"

"ভালবেসে কাঁদাই ভাল, না—না ভালবাসাই ভাল ?"

"না ভালবাসাই ভাল।"

"কেন ?"

"কেন ? এতো অতি সাধারণ কথা। যেখানে জানা কথা ভালবাসলে কাঁদতে হবে, সেখানে সাধ করে কাঁদতে যায় কে ?"

অপর্ণা পুনরায় প্রশ্ন করিল "ভালবেসে প্রণয়ীকে জানতে দেওয়া উচিত, না, গোপন রাখাই উচিত ?"

"গোপন রাখাই কর্ত্তব্য।"

"কেন ?"

"কারণ তাতে পরিচয় গাঢ় হবার সুযোগ পায় না। সুতরাং শরতের মেঘের মত সে পাতলা হওয়াতেই উড়ে যায়। দুঃখ হয় না। এতে নিজেরও ভাল, সমাজেরও মঙ্গল।

"সমাজ কি প্রাণের চাইতেও বড় ?"

খ্যাঁদা উত্তর দিল, "অবশ্য। আপন স্বার্থপর দৃষ্টিটি অতি ক্ষুদ্র। এটা একটা ভ্রম। এর কোন মূলগত ভিত্তি নেই। মানুষ চায় নিজে সুখী হবে। প্রকৃতপক্ষে দশজন সুখী না হলে নিজে সুখী হওয়া যায় না। কবি কবিতা লেখে পড়ে অন্যে আনন্দ পায়। ধনীর বিলাস ব্যসন কেন?—সাধারণের তৃপ্তির জন্য। সবাই অপ্রত্যক্ষ ভাবে পরেরই মনস্তুষ্টি সাধন করে থাকে। পরের সুখই তো নিজের সুখ।

দশের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে মিশিয়ে তাদের দুঃখের বোঝা বয়েও আনন্দ আছে অপা।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—"কিন্তু প্রেমের এই ত্যাগের মূল্য? খ্যাঁদা উত্তর করিল,—"বিরহই তো প্রেমের মর্য্যাদা। বিরহের আগুণ হৃদয়ের সমস্ত বাসনা কামনাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে এক পবিত্র বস্তুতে পরিণত করে তোলে। প্রেম করে নাঁকি সুরে তার প্রতিদান ভিক্ষা করা স্বার্থপরতা—নীচুতা। কিন্তু যাক্ সে কথা আমি চললুম। দেখি তোর ভ্রাতৃরত্নটি কোথায়।"

অপর্ণা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা খ্যাঁদ্দা হাসির আবরণে তোমার এই হৃদয়ের গাম্ভীর্য্যকে ঢেকে রাখ কেমন করে?"

খ্যাঁদা বলিল,—"কি বকছিস্ আমি যাই।"

অপর্ণা—হাসিয়া বলিল,—"তোমার এই চপলতার অন্তরালেও তোমার প্রকৃত সত্বাটি আমার নিকট গোপন রাখতে পারনি খ্যাঁদ্দা। কেউ তোমায় দেখেছে। আমি বুঝেছি। নারী সব বুঝে। তা'রা' যাদু জানে কিনা! নারী কুহাকিনী ঠিক নয়?"

খ্যাঁদা সর্ব্ব চপলতা বিসর্জ্জন দিয়া মুহূর্ত্তে যেন আপনার প্রকৃতরূপটি ধারন করিল। ধীরে ধীরে সে কহিল,—"না। নারী কুহকিনী নয়। তারা দেবী। আমি আসি অপা।

খ্যাঁদা আর কোন দিকে না তাকাইয়া বরাবর বাহিরে চলিয়া আসিল। অপর্ণা তাহার দিকে খানিকক্ষন অপলক দৃষ্টিতে

তাকাইয়া রহিল ওপরে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে বুঝি আপন অজ্ঞাতসারেই কহিল—বন্ধু।

বাহিরে আসিয়া খঁ্যাদা দেখিল অপরেশের ঘরে ঠাকুর্দ্দা বসিয়া রহিয়াছেন। অপরেশ নাই। খঁ্যাদা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঠাকুর্দ্দাকে প্রশ্ন করিল,—"অপ্ রা এসেছে ঠাকুর্দ্দা?

তাহার প্রশ্নের ভঙ্গীতে মনে হইল যেন এই মুহূর্ত্তে কোথাও আগুন লাগিয়াছে!

ঠাকুর্দ্দা উত্তর দিলেন, "না তো। কিন্তু তোকে যে এত ব্যস্ত দেখাচ্ছে!

খঁ্যাদা যেন ঠাকুর্দ্দার শেষ প্রশ্নটি না শুনিয়াই ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,—"ব্যাঙ্গাচি গেল কোথায়? একবার পেলে হয়। দেখব্ সে কত বহাদুর ছেলে হয়েছে। নাকে খত্ দেওয়াব তবে ছাড়ব্। নয়তো আমার নাম খ্যাঁদাই নয়।"

তাহার কথার ভঙ্গীতে ঠাকুর্দ্দার হাসি পাইল। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ও নামটি কেমন শ্রুতিমধুর, নয়?"

খঁ্যাদা বাসিক ছেলে হইলে ও সেই মুহূর্ত্তে রসিকতা ভাল লাগিল না। বলিল,—না ঠাকুর্দ্দা ঠাট্ট নয়।"

"আমিই কি তাই বলেছি?"

"না সত্যি।"

ঠাকুর্দ্দা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেনরে, হলকি?"

"সে কথা আর বলতে। কিছুক্ষণ আগে দেখি ও কোথাও—বেরুচ্ছে। দেখেই বুঝতে পারলুম। আমিও সঙ্গ নিলুম। বললুম, কোথায় যাচ্ছিস? মুখ মুছে মিথ্যে বললে, না কোথাও নয়তো। যেন নিরীহ গোবেচারীটি—। কোথাও যাবিনে আচ্ছা বেশ ভাল কথা। আমাদের বাড়ী নিয়ে গেলুম। এটা সেটা নানা আলোচনার পর বললুম,—তুই একটু বোস, চা করে আনি। একটু সময়; চা নিয়ে ফিরে এসে দেখি শ্রীমান

পালিয়েছেন। বুঝলেন ঠাকুর্দ্দা। আজ ওকে ঐ চা খাওয়ার তবে ছাড়ব।”

বিষন্ন চিত্তে ম্লান হাসিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন,—“ঠাণ্ডা চা খাইয়ে বুঝি ওকে আর পথে আনা যাবে না খঁ্যাদা। অন্য পথ ধরতে হবে।

“চলুন না আপনাদের বাড়ী, ওখানেই হয়তো গিয়ে থাক্‌বে।”

“বেশ চলো”

পথে চলিতে চলিতে খঁ্যাদা বলিল—“লক্ষ্য করেছেন ঠাকুর্দ্দা অপরেশ দিন্ দিন্ কেমন হয়ে যাচ্ছে?”

ঠাকুর্দ্দা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি কেমন গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন। খঁ্যাদা বলিল, কিন্তু কি হল বলবেও না, আবার জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে, কৈ কিছুতো হয়নি? সদাসর্ব্বদা থম্‌থমে কালো মুখ। আমি যা দুচোখে দেখতে পারি না। জগতে আনন্দ করবার জন্যেই মানুষের জন্ম। এ জগৎ আনন্দধাম এটা আমাদের শাস্ত্রেরও কথা, এখানে দুঃখ করে কে? যে মূর্খ সেই। ঠাকুর্দ্দা একটু উদাসীন হাসি হাসিলেন।

ধীরে ধীরে উভয়ে আসিয়া ঠাকুর্দ্দার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঠাকুর্দ্দা খঁ্যাদাকে বসিতে বলিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে তিনি মিনতিকে ডাকিলেন। মিনতি আসিলে, অপরেশ আসিয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিনতির বুকখানি ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কি কহিবে বুঝিয়া উঠিতে পরিল না। সত্য কথা বলিবার তাহার সাহাস হইল না। আরক্তিম বদনে উত্তর দিল—“নাতো!”

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন “আচ্ছা তুমি যাও।”

মিনতি চলিয়া গেল। এতক্ষণে ঠাকুর্দ্দা ভাল করিয়া মুখ খুলিলেন। ঠাকুর্দ্দা বলিলেন,—

“আচ্ছা খঁ্যাদা বল্‌তো ভবিষ্যতে মানুষ হয়ে কোন ছেলেটি গায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে বলে মনে হয়?”

খ্যাঁদা উত্তর দিল, "যদি কেউ পারে তবে একমাত্র অপরেশ।"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন "তুই তাহলে চিনেছিস্ ?

আপনার বহুপূর্ব্বেই ঠাকুর্দ্দা। আর সেই জন্যইতো ওর সম্বন্ধে আমার এত আগ্রহ !"

ঠাকুর্দ্দাবললেন, কিন্তু আজ আমার সন্দেহ হচ্ছে, ও বুঝি আর মানুষ হতে পারবে না। আমি ওর প্রতিভাকে লক্ষ্য করেছিলুম। তাইতো নিজেহাতে ওর শিক্ষারভার নিতে চেয়েছিলুম। আমার সাধ ছিল ও মানুষ হোক। যদি কেউ চেষ্টা করে, এখনও ওকে মানুষ করতে পারবে।

খ্যাঁদা বলিল,—"আপনি থাকতে ......।

ঠাকুর্দ্দা একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেই কথাই আজ আমি তোকে বলতে চাই—শোন্ খ্যাদা। এ কথা—আমি আর আর কাউকে বলিনি। এমনকি নিকটতম আত্মীয় বন্ধুদের কাছে ও নয়। আমি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়ে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়েছিলুম। তিনি বলেছিলেন, যে দিন আমার বয়স ৭০ বৎসর পুর্ণ হবে, সেদিন আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। জানিস্ সেই শেষের দিনটির আর কত বাকী ?

খ্যাঁদা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত ?"

"মাত্র তিন দিন।"

"মাত্র তিন দিন্।" খ্যাঁদা শিহরিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ। তাই আজ তোকে একটি কথা বল্‌ব। জানি তুই খুব দুষ্টুছেলে। তবু তোর মধ্যে একটি জিনিস আছে। সে হচ্ছে তোর কর্ম্মদক্ষতা। আলোচনা সভাতেই তই তার পরিচয় দিয়েছিস। ভগবান এক শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেন, সেবার জন্য, আর এক শ্রেণী উপভোগের নিমিত্ত। তুই এই প্রথমোক্ত শ্রেণীর। পৃথিবীতে তোদের প্রয়োজনই সর্ব্বাধিক। তোদের কোন সৃজনী প্রতিভা নেই। কিন্তু কোন সৃজনী প্রতিভা তোদের আশ্রয় ভিন্ন উঠতেও

পারে না। এই দিক থেকে সমাজে তোদের স্থানই সবার ঊর্ধ্বে। কিন্তু মানুষের নিকট থেকে সেই প্রকৃত প্রাপ্যটিই তোদের ভাগ্যে জোটে না, তবু ভগবানের আশীর্বাদে তোদের সহ্যগুণ সেই অবহেলার সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। তাই বলে কোনদিন বিখ্যাত একটা কিছু হয়ে যে তোরা গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবি, সে আশা কখনও করি না। আর তোর কথা বলতে গেলে, হয়তো তোর মাঝে তেমন কিছু আমি দেখতে পাইনি, তবুও একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সে তোর গ্রাম-প্রীতি। তোর সব চাইতে বড়গুণ তুই অপরেশকে ভাল বাসিস্। হয়তো সেও তোর গ্রামের স্বার্থেই। আচ্ছা খ্যাঁদা আমি যদি তোকে একটি আদেশ করি তুই রাখবি না?"

খ্যাঁদা নম্র ভাবে উত্তর দিল, "বলুন?"

"অপরেশকে মানুষ করার ভার আমি তোকে দিতে চাই?"

"আমি?"

"হ্যাঁ তুই। আমি জানি তুইই ওকে মানুষ করতে পারিস্। কিন্তু তোকে বেগ পেতে হবে অনেক। অপরেশ হয়তো তোর উপর অসন্তুষ্ট হবে, প্রতিভার যখন পতন আসে, কোন হিতোপদেশই সে শুনতে চায় না। কিন্তু তাই বলে যেন পিছিয়ে যাস্নে, এই আমার অনুরোধ। মনে রাখিস্ মরণের পর পরপারে থেকেও এই দেখতেই আমি আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে থাকব যে, আমার অপরেশ মানুষ হয়েছে। আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন সফল হয়েছে। আর তার গৌরব ভাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার খ্যাতিতে আমার গ্রামখানিও গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে। বল্ তুই আমার কথা রাখবি?" ঠাকুর্দা খ্যাঁদার হাত ধরিলেন।

খ্যাঁদা কিছু বলিল না। কেবল নীরবে ঠাকুর্দার চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল।

সতের

দিবস ত্রয় পরে সত্যই ঠাকুর্দা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে অপরেশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ঠাকুর্দা অপরেশের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, "তুমি মানুষ হও।" অপরেশ, খ্যাঁদা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া তাঁহার নশ্বর দেহখানি জলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করিয়া দিয়া আসিল। এইতো মনুষ্য দেহের পরিণাম। তবুও মোহমুগ্ধ অপরেশকে এই চিতার উদাসী দৃশ্যও দোলা দিতে পারিল না। অপরেশের তেমন কোন দুঃখই হয় নাই। অথচ দু'দিনের পরিচয়ে ঠাকুর্দা খ্যাঁদার মস্তকে একি গুরু দায়িত্বের ভার চাপাইয়া দিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে অপরেশ আপনার পাঠাগারে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া সে একটি গানের খুব সুর ধরিল,—

"হায়!"

"লাজুক মেয়ে কয় না কথা, ভালবাসে, একিরে দায়।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সেখানে খ্যাঁদার আবির্ভাব হইল। সে সম্পূর্ণ গানের পয়ারটি শ্রবণ করিল। গানের শেষে রং করিয়া উত্তর দিল।

"যেতে যেতে জলের ঘাটে ফিক করে হেসে যে চায়।"

হঠাৎ অপরেশের বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল।

গোপন অপরাধীর ধরা পড়িবার মতন তাহার বদনখানি পাংশু হইয়া গেল। সে ভারি লজ্জিত হইল।

কিন্তু এইটুকু লজ্জা দিয়াই খ্যাঁদা ক্ষান্ত হইল না। বলিল,

তারপর—তারপর? বল না হে ব্যাঙ্গাচী কবি? এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেকেই গাহিয়া উঠিল।

"তাই না দেখে অপরা কবি ধূলাতে যে লুটায়।" অপরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল,—ইয়ারকি হচ্ছে না?"

আর সে বিরক্ত হইবে বা না কেন? নির্জ্জনে বার-বার মধুর ধ্যান ভঙ্গ করিলে কে না বিরক্ত হয়?

খ্যাঁদা বলিল, "বাঃ ইয়ারকির কি হল শুনি? তুই গাইলি আমি না হয় একটু রস করলুম। তা বেশ বেশ গাতি ভাই আর ও গা। সুন্দর গান্‌টি, যেন প্রেমরসে টস টস করছে।"

অপরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল,"সব সময় তামাসা ভাল লাগেনা, খ্যাঁদা।"

"বেশ থাক তবে গান। এখন বলতো কে সেই মধুর রস সাগর রূপিণী যে আমাদের অপরা কবিকে এমনই দায়ে ফেলেছে? খ্যাঁদা গান ধরিল :—

"যারে দেখে অপরা কবি ধূলায় লুটায় পায়েতে পায়।"

মুহূর্ত্তের জন্য অপরেশ নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল : "ইয়ারকি ভাল লাগে না খ্যাঁদা তুমি যাও! আমি তোমার রহস্যের পাত্র নই। যারা উপযুক্ত তাদের সঙ্গে ইয়ারকি দেবে, আমার সঙ্গে নয়। বন্ধুত্বের দাবী সম্মানকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। আমাদের বংশগত এবং মর্য্যাদাগত পার্থক্যটাও তোমার মনে রাখা উচিত।"

খ্যাঁদার পায়ের তলার মাটি যেন সরিয়া গেল। অপমানে তাহার বদন আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। ভাবিল ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু হঠাৎ ঠাকুর্দার কথা মনে পড়িল, নিজের মান অপমান লইয়া বসিয়া থাকিলে সমাজের হিতসাধন কখনও সম্ভব নয়।' খ্যাঁদা বলিল, "সে কথা সত্যি অপরেশ। আমি সামান্য এক কেরাণীর ছেলে, হেয় কুলে জন্ম। আর তুমি সহস্রপতির ছেলে, কৌলিন্যের

মর্য্যাদায় সমাজের শীর্ষে তোমাদের স্থান। তোমার কাছে বন্ধুত্বের দাবী করা,—সে আমার বাতুলতা মাত্র। কিন্তু তবুও তোমায় আমি বিরক্ত করবই যতদিন না তুমি মানুষ হবে। হয়তো তুমি বিরক্ত হবে, তাড়িয়ে দেবে। বন্ধুত্বের দাবীতে না হোক, গ্রামের ছেলের দাবী নিয়ে তোমার নিকট আসব। অপমান করবে' হাসিমুখে এসে তোমায় ডাকব। তবু মনে রেখ, তোমায় আমি অধঃপাতে যেতে দেব না। তোমাকে মানুষ করবার ভার রয়েছে আমার, মৃত্যুকালে ঠাকুর্দা দিয়ে গেছেন। আমাকে তাঁর আদেশ পালন করতেই হবে। তোমার প্রতিভাকে, তোমার হেঁয়ালীতে নষ্ট হতে দেবো না। ততদিন তোমায় বিরক্ত করবই—যতদিন না তোমার গৌরবভাতি ছড়িয়ে পড়বে দেশময়, তোমার নামে আমার গ্রামও না হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। তুমি না হবে কবি।

আঠার

অপরেশের মন অনুশোচনায় ভরিয়া গেল। ভাবিল খঁ্যাদার নিকট ক্ষমা চাইতে হইবে! তখন বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। সে খঁ্যাদাদের বাড়ী যাইবে ঠিক করিল।

আজ দুইদিন খঁ্যাদা আসে নাই! অপরেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় খঁ্যাদা আসিয়া উপস্থিত হইল। অপরেশ ছুটিয়া গিয়া খঁ্যাদার হাত দুটি ধরিয়া অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। বলিল, "আমায় ক্ষমা কর ভাই। সেদিন আমর মন ভাল ছিল না। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর অনুশোচনায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বল্ তুই রাগ করবিনে?"

খঁ্যাদা হাসিয়া বলিল, পাগল! আমি রাগ করব তোর উপর! আমি তখনই বুঝেছিলাম অপরা যে সে রাগ তোর মনের নয়। এটা কেবলমাত্র তোর ধৈর্য্যচুতি। মানুষকে বাইরে থেকে কোন দিন আমি বিচার করিনে। তুই যদি সেদিন মনোক্ষুণ্ণ হয়ে বাইরে কিছু না বলতিস্ তাতেই বরং আমি দুঃখিত হতুম।

"সত্যি খঁ্যাদা, আমি তোর উপর একটুও ক্ষুণ্ণ হইনি।"

খঁ্যাদা অপরেশের পিঠ চাপাড়াইয়া বলিল, "সে আমি জানি। কিন্তু তুই আজও আমায় চিনতে পারিস্‌নি। আমি যে তোর উপর রাগ করতে পারি না। কোনদিন করবও না। কিন্তু দুঃখ শুধু এই, তোর সম্বন্ধে আমার যে উচ্চ—ধারণা সেকি পূর্ণ হবেনা কোন দিন?"

খঁ্যাদা অপরেশের হাত ধরিল।

অপরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "এইটেই—তোদের বাড়াবাড়ী। আমার এমন কি আছে যার জন্যে তোর এই উচ্চ ধারণা?"

"ফুলের সৌরভ না পেলে কখনও প্রজাপতি এসে জোটে-?"

"আমিও তো তোর উপর এমনি উচ্চ আশা পোষণ করতে পারি।"

"উচ্চ আশা কিনা জানি না। তবে আশা করতে পারিস্ অনেক কিছুই। আর যেটুকু আশা তুই করতে পারিস্ সেটুকু দিতে আমি কখনই কুণ্ঠিত হব না। আমার সে সাহায্য, তোর চাওয়া না চাওয়ার উপর নির্ভর করবে না।"

অপরেশ বলিল,—কি আমি কি করতে পারি? মনে হয় আমার সমস্ত শক্তিই যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। বাল্যের যে আনন্দের জোয়ার ছিল বুকে, আজ যেন তা কোথায় ধীরে লুকিয়ে যাচ্ছে। একটা অবসাদে আমি যেন প্রতি পদে নিজেকে অসহায় মনে করছি। আমি কিছু করতে পাচ্ছি না।"

"কিন্তু এই অবসাদের কাছে তোকে হার মানলেও তো চলবে না। কবিতা লেখা কেন বাদ দিয়েছিস্ বলতো?"

"বাদ আজও আমি দেইনি, কিন্তু পূর্বের মত সে উৎসাহ, সে অনায়াসে লিখবার ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলেছি।

খ্যাঁদা বলিল, "কারণ সেই নিষ্কলঙ্ক জীবন আজ আর তোর নেই। কবির প্রাণ চাই শিশুর মত সরল, আকাশের মত উদার। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। কুটিল প্রাণে কবি হওয়া কখনও সম্ভব নয়।"

অপরেশ বলিল,—"কুটিল কাকে বলে সে আমি জানিনা। আমরা হৃদয়ের কুটীলতা বল্‌তে যা বুঝি, সেত কিছু খুঁজে পাইনে। সেদিনের আচরণে হয়তো ভেবেছিস্ আমি তোদের ঘৃণা করতে শিখেছি। ধন বা আভিজাত্যের গৌরব আমার মোটেই নেই। তবু সেই কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তের অসত্য বিরক্তি প্রকাশটিও কি তোদের কাছে সব হয়ে থাক্‌বে? আমার প্রকৃত অন্তরটি কি তোরা কেউ দেখবিনে? তবে সবাই মিলে কেন বলবি আমি কুটিল হয়েছি?"

খ্যাদা বলিল, "আমি যে কুটিলতার কথা বলেছি তার মানে এ নয় অপরা। তার মানে তুই তোর মনের সেই উদারতা সেই বিস্তির্ণতাকে হারিয়ে ফেলেছিস্। পবিত্র চিন্তার পথ ভ্রষ্ট হয়ে মন তোর জটীল আবর্তে পড়ে তার স্বচ্ছতাকে হারিয়ে ফেলেছে। তার সাক্ষী তোর ঐ অন্ধকার বদনখানি। তার সাক্ষী তোর ঐ কপালের কুঞ্চন রেখা। তুই তোর অবাধ চলার গতি হারিয়ে ফলেছিস্। আমার মনে হয় তোর ঐ কোমল মনের মধ্যে কোথাও এমন ঘা লেগেছে যাতে……।

অপরেশ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "সত্যি খ্যাদা জটীলতা, কুটিলতা বলতে যা বলিস্ আমি তোর হাত ধরে বল্‌ছি আমি আজও তেমন কিছু হইনি। তবে হ্যাঁ, ঘা আমার লেগেছে।"

খ্যাদা বলিল,—কিন্তু কি সে ঘা, সেকি তুই আমার নিকট কখনও ভেঙ্গে বলতে পারিস্ না? অপরেশ নিরুত্তর রহিল। খ্যাদা পুনরায় বলিল, "আমার কাছে গোপন করা তোর মোটেই উচিৎ নয়। দুঃখের কথা গোপন রাখলে সে জ্বালাবার সুযোগ পায় বেশী। কিন্তু সে গোপন কথা প্রকাশ করা যায় কার কাছে? সমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে। আর আমি সেই বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে বল্‌ছি নিঃসন্দেহে সব খুলে বল?

অপরেশ ম্লান হাসিয়া বলিল,—"কি?"

"তুই মিনতিকে ভালবাসিস্?

অপরেশের বদন নত হইল। ধীরে ধীরে বলিল, হ্যাঁ।

কিন্তু এ কথাটি লুকিয়েই বৃথা তুই এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলি। ভালবাসা তো অন্যায় নয়। হৃদয়ের বিস্তৃতিতো আনে সেই। কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে জানা চাই।

আমি জানি তোর ভালবাসা আর আমার ভালবাসা এক জিনিস নয়। আমরা যেমন চপলতার বশে ভালবাসতেও পারি, তেমনি অনায়াসে ভুলতেও পারি। কিন্তু কবির ভালবাসা, সে ফিরতেও

জানে না, ফিরাতেও জানে না। তাঁদেরই প্রেম, পৃথিবীতে রচনা করে অমর অনবদ্য কাব্যের তাজমহল। তাঁদেরই প্রেম রাধাকৃষ্ণের লীলা, তাঁদের প্রেম লায়লা-মজনুর চির বিরহ মধুর কাহিনী। তাঁদেরই প্রেমের অবদান আগ্রার তাজমহল। কিন্তু তুই ভুল করেছিস্। আমায় আরও অনেক পূর্বে জানানো উচিত ছিল। ঠাকুর্দা জীবিত থাকতে। অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলেই জীবনকে সে করে দেয় কলঙ্কিত। ভীরুতা কাটিয়ে প্রকৃত প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তোকে।

সেদিন বন্ধু বলে তুই আমায় বিশ্বাস করতে পারিস্ নি। হয়তো আজও পারিস্নে। আর আমি চিরদিন তোকে অন্তরের বন্ধু বলে জানি, জানবও।

অপরেশ বলিল, "ভুল আমি তোকে কোন দিনই বুঝিনি, বুঝবও না। শুধু আঘাতে যে.........

খ্যাঁদা হাসিয়া বলিল, "বুঝিরে বুঝি!"

'শ্যাম রাখি কি কূল রাখি
উপায় কিগো উপায় কি
প্রেম করে হায়, পরাণ রাখা দায়।'

কিন্তু তাই বলে যাদুধন কবিতা লেখাটি বাদ দিও না। আমি বলছি, আমি আমার···

অপরেশ বাঁধা দিয়া বলিল, "চুপ ঐ বাবা আসছেন।"

দেখা গেল জীতেনবাবু মন্থর গতিতে এই দিকেই আসিতেছেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে, অপরেশ ও খ্যাঁদা উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইল। জীতেনবাবু বলিলেন,

"থাক থাক বোস। উভয়ে উপবেশন করিল।

জীতেনবাবু খ্যাঁদাকে প্রশ্ন করিলেন, "তারপর কেমন আছিস খ্যাঁদা?

"কোন প্রকার।"

"কেন রে কোন প্রকারে কেন ?"

"মধ্যবিত্তদের এ ছাড়া আর উপায় কি বলুন ?"

জীতেনবাবু বলিলেন, সে ঠিক্। কিন্তু যাক্ সে কথা।

তুই কলকাতা যাচ্ছিস্ কবে ?"

"পরশু যাব ভাবছি।

"তুইতো Science নিয়েই পড়বি ?

"বাবাতো তাই বললেন।

জীতেনবাবু বলিলেন, "আমি ভাবছি অপরেশের কথা। ওকে কি করি। সায়েন্স পড়িয়ে যদি মেডিক্যাল লাইনে ঢুকিয়ে দিতে পারতুম।"

খ্যাদা উত্তর দিল,—"ওর সায়েন্স না পড়াই ভাল।"

"কেন ?"

"ওর বরাবরই আর্টের দিকে ঝোঁক। ঐ পথেই ও সুবিধে—করতে পারবে বলে মনে হয়। আর তা ছাড়া ও একজন ডাক্তার হোক এ আমরা চাইনে। ও একজন সাহিত্যিক বা কবি হোক্ এই দেখতেই আমরা ইচ্ছা করি।"

জীতেনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ আর্টের দিকে ওর একটু ঝোঁক আছে বটে। হয়তো ভবিষ্যতে উন্নতিও হতে পারে। একটু ভাবিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, "আচ্ছা তোর সঙ্গে ওকে কলকতায় পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় ?"

"সে তো অতি উত্তম কথা।"

"কিন্তু থাকা খাওয়ার অসুবিধাটা ভাবছি।"

খ্যাদা বলিল, "হ্যাঁ তা একটু অসুবিধা হবে বৈকি। আমাদের বাসাটা একেবারেই ছোট। তার আবার অন্ধকার গলি"। জীতেনবাবু বলিলেন, "না না যদি কলিকাতায় থেকেই পড়ে তবে না হয় মেস টেস্ দেখে থাকবেখন।" তিনি পুনরায় খানিক কি ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, "তাহলে তোর সঙ্গে পাঠিয়েই দেই

কেমন ?" সময়ও তো আর নেই। এক মাসের মধ্যেই যখন এ্যাডমিশন নিতে হবে।

খ্যাঁদা বলিল, "বেশতো, আমি নিজে ওকে ভাল মেসের ব্যবস্থা করে দেব। আমার পরিচিত দীনেন্দ্র বাবুর একটি ভাল মেস আছে।"

জীতেনবাবু বলিলেন,—আচ্ছা বেশ, তবে ঐ কথাই রইল। পরশুই তোর সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে।"

ধীরে ধীরে জীতেনবাবু যেমনি আসিয়াছিলেন, তেমনি আবার বাহির হইয়া গেলেন।

খ্যাঁদা রহস্য করিয়া অপরেশকে বলিল,—"কিহে কবি, বান্ধবীর জন্য প্রাণ কাঁদবে নাত ?"

অপরেশের বদন রক্তিমাভ হইল।

উনিশ

দিবাকর তাহার শেষ রশ্মিজাল আকাশের বুকে ছড়াইয়া দিয়া অস্তমিত হইতেছেন। নভঃ পটে এক স্নিগ্ধ ছায়া পড়িয়াছে। সে দৃশ্য কবির আনন্দের। উহা তাহার বুকে পরলোকের আভাষ বহিয়া আনে। বিরহীর সে আনে বিদায়ের বাণী আর নয়নের জল।

বাড়ীর পাশেই ছোট বাগান। নিম্নে মৃত্তিকা, শ্যামল ঘাসের ওড়না পরিয়া যেন তন্বী সুন্দরীর মত যৌবন ভারে ঢল ঢল করিতেছে। ঊর্দ্ধে জবার ডালে সহস্র রক্ত বরণ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া রাঙ্গা হাসি হাসিতেছে।

মিনতি আসিয়া জবার একটি পেলব শাখা ধরিয়া দাঁড়াইল। পশ্চিমাকাশে কে যেন রক্তের আলপনা আঁকিয়া দিয়াছে। জবার সবুজ পত্রদল যেন সোহাগে নুইয়া পড়িয়া মিনতির রাঙা কপোলদ্বয় স্পর্শ করিতেছে। মিনতি আত্মভোলার ন্যায় নির্বিচারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কি ভাবিয়া একবার পিছনে তাকাইয়া, দূরে অপরেশকে আসিতে দেখিতে পাইল।

প্রেমিকার স্বাভাবিক অভিনয় করিতে মিনতিও ভুলিল না। মিনতি অন্যমনস্কতার ভান করিয়া পশ্চিমাকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। সে যেন অপরেশকে দেখিতে পায় নাই। ধীরে ধীরে অপরেশ সেখানে আসিল। পশ্চাৎদিক হইতে নিঃশব্দে সে মিনতির স্কন্ধে হাত রাখিল। মিনতি ফিরিয়া তাকাইল না বা কোন সাড়া দিল না। শুধু একটি বিরাট্ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। অপরেশ ডাকিল, "মিনতি?" মিনতি কোন প্রকার অভিমান ভঙ্গের লক্ষণ দেখাইল না। অপরেশ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বদনখানি

নিজের দিকে ফিরাইল। মিনতি তাকাইল, কিন্তু আপনা হইতেই পুনরায় তাহার বদন নত হইয়া আসিল। অপরেশ তাহাকে বাহু বেষ্টনে বাঁধিয়া অদূরে তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপর উপবেশন করিল। অপরেশ বলিল,

"আচ্ছা মিনতি ?"

মিনতি নীরবে আঁখি তুলিয়া তাকাইল। অপরেশ বলিল, "তুমি কি কখনো আমার সঙ্গে কথা বলবে না? আমাকে আঘাত দিয়ে তুমি খুব আনন্দ পাও না ?"

আমি বার বার লক্ষ্য করেছি আমাকে আঘাত দেবার তোমার একটা উদ্‌গ্র বাসনা আছে। তাই শত মিনতিতেও আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কোনদিন কথা বলনি। কোন প্রশ্নের উত্তর দাওনি। "মিনতি"

মিনতি পুনরায় বদন তুলিয়া নিঃশব্দে আঁখিতে উত্তর দিল, "কি ?"

"আমার কথা তোমার কোন দিন মনে থাকবে ?"

মিনতি দুষ্টুভাবে উত্তর দিল,—"একটুও না। ভোলা, টুনু, অপর্ণা সবার কথাই মনে থাকবে কিন্তু তোমার কথা একটুও মনে থাকবে না।"

অপরেশের সন্দিগ্ধ মনে ঐ কথাটাই যেন আঘাত করিল। এমন সন্দেহ এবং ভয় প্রেমিকের পক্ষে স্বাভাবিক। অপরেশ এমন ব্যাকুল ভাবে মিনতির হাত ধরিল যে, মিনতি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। অপরেশ বলিল, ?"

"না মিনতি হাসি নয়। সত্যি বল ?"

"সত্যি বলিনি ?"

—"না রহস্য রাখ।"

"আমার সবার কথাই মনে থাকবে। আমার কথাই কারও মনে থাকবে না।"

অপরেশ যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া, "ওঃ এই কথা। মিনতি, একটি কথার উত্তর দেবে?"

—"কি?"

"তুমি আমায় ভালবাস?"

মিনতি লজ্জায় অপরেশের বুকে মুখ লুকাইল।

অপরেশ সোহাগে তাহার শিথিল করবী আরও শিথিলতর করিয়া দিতে লাগিল।

"মিনতি, আমায় একটি জিনিষ দেবে?"

"কি?"

"আগে বল দেবে।"

"থাকলে তবে তো?"

"—আছে।"

"তবে দেব। কি?"

অপরেশ তাহার চিবুক ধরিয়া বদন খানি আরও নিকটে আনিয়া কহিল,—তোমাকে।"

মিনতি উত্তর দিল: নিতে পারলে নেবে।"

"—তুমি দেবে না?"

একটা কৌতুক-দৃষ্টিতে মিনতি অপরেশের দিকে তাকাইল। অপরেশ প্রশ্ন করিল,—

"বল?"

"হ্যাঁ।"

"দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"অন্তরীক্ষ, বাতাস, জল, দশদিক পাল আর অন্তর্য্যামি সাক্ষী, তুমি আমার। এরা সত্যি হলে আমি তোমায় পাব!"

মিনতি প্রশ্ন করিল,—"যদি না পাও?"

"কেন পাবনা? আমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে চাই।

"আমি আমার সর্ব্বশক্তি দিয়ে তোমায় চাইব। তোমার জন্য যে কোন বাধার সম্মুখীন হব।"

"যদি ওরা না দেয়।"

"তবে মনে রেখ সমাজের নিষ্পেসনে, আমার আত্মীয়দের কুসংস্কারে যদি আমি তোমায় না পাই, তবে আমি হব এই সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম শত্রু। যে ভিত্তির উপর এরা দাঁড়িয়ে অত্যাচারের সুযোগ পায় তাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবো ধুলোর সঙ্গে।

"—ছিঃ ও কথা বলতে নেই।"

অপরেশ বলিল: "যাক সে কথা। আমি কিন্তু পরশু কলকাতায় যাচ্ছি।"

হঠাৎ যেন মিনতির বক্ষে কিছুতে আঘাত করিল। তাহার বুকের রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল,

"—সত্যি?"

"—হ্যাঁ।"

"—কলকাতায় গিয়ে আমাকে ভুলে যেও।

"—কেন?"

"—সেখানে কলেজ অনেক মেয়ে পাবে। তাদের ভালোবেসো তুমি সুখী হবে।"

"—তুমিও বুঝি ঐ রকম করবে?"

"সে ভয় নেই আমি তোমায় ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসব না।

"—আমিও। চিঠি দিও মিনতি। তুমি যদি চিঠি না দাও তবে কলকাতা থেকেও আমি পাগল হয়ে যাব। বল চিঠি দেবে?"

"—হ্যাঁ।"

বিশ

কলিকাতার একটি বিশিষ্ট রাজপথ। একদল ছাত্রছাত্রী নানা আলোচনা করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতেছিল। একটি ছাত্র পার্শ্ববর্ত্তিনী তরুনীটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,—শুনেছে সুচিত্রাদেবী! সপ্তকাণ্ডরামায়ন যে আজ সম্পূর্ণ উল্টে গেল।"

সুচিত্রা—"মানে?"

১ম—"ঐ যে আমাদের সেক্‌সনে এক কোণে বোকা মতন ছেলেটি বসে থাকে, সাত চড়ে রা করে না। একেবারে গেঁয়ে ছেলেটি!

সুচিত্রা—"হ্যাঁ তা হয়েছে কি?"

১ম—কেন? আপনি শোনেননি?"

সুচিত্রা—"কি?"

১ম—ও ছেলেটি নাকি একজন কবি। একেবারে যে সে নয়। কলেজ মেগাজিনে এবার 'নারায়ণ' নামে যে কবিতাটি বেরিছে পড়েছেন?

সুচিত্রা—হ্যাঁ পড়েছি!

১ম—কবিতাটি কেমন লাগল আপনার?

সুচিত্রা,—"ভাবে, ভাষায়, নূতনত্বে ও ছন্দ-বৈচিত্র্যে কবিতাটি সত্যি অনুপম। অনেকের মুখেই কবিতাটির প্রশংসাও শুনেছি—কিন্তু।"

১ম—অবাক্ সুচিত্রা দেবী, অবাক কাণ্ড। যাকে বলে কিনা একেবারে থাণ্ডার ষ্ট্রাইক। আমাদের কল্পনাতীত।

সুচিত্রা,—তাহলে ওঁর নামই অপরেশ চট্টোপাধ্যায়?

১ম—অবশ্য। কিন্তু এ যেন্ বিশ্বাসই হতে চায় না।"

সুচিত্রা নিজে আর সে বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয় ছাত্রটি তাহাদের আলোচনা সবই শ্রবণ করিতেছিল। সে একটু সুচিত্রা দেবীর অনুরক্ত। সেক্‌সনে কবি বলিয়া উহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হইতেও চলিয়াছিল। সুচিত্রা সেক্‌সনের সুন্দরীদের মধ্যে সেরা। অনেক ছেলেই তাহার সহিত প্রেম করিবার জন্য ব্যাকুল। মিহির বড়লোকের ছেলে। সে সুচিত্রার জন্য একেবারে পাগল। লক্ষ্য টাকা ব্যয় হইলেও সুচিত্রাকে তাহার চাই। একথা সে ছাত্র সমাজে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সুচিত্রাও জমিদারের কন্যা। পিতার একমাত্র মেয়ে। আধুনিক মেয়ে হইলেও তাহার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বর্ত্তমান যুগের ফ্যাসন তাহাকে তেমনভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সহপাঠীদের সহিত রেষ্টুরেণ্টে বসিয়া চা পানের তাহার মোটেই অভ্যাস নাই। অনেক প্রণয়ী তাহাকে রেষ্টুরেণ্টে লইয়া যাইতে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তবুও তাহাকে পাইবার আশা ত্যাগ করে নাই। দ্বিতীয় ছাত্রটিও এই দলেরই একজন। তাহার নাম অপরেশ। সে নিজে কবি ভাবাপন্ন। সুতরাং সেই দিক হইতে সুচিত্রাকে পাইবার তাহার অন্ত নাই। অপরেশের প্রশংসায় তাহার মনে জ্বালা ধরিতেছিল। সে বলিল,

"কি আর এমন কবিতা! আমি যে না পড়েছি তা তো নয়?

রমা নামে আর একটি তরুণী উত্তর দিল,—

"—ধৃষ্টতা মাপ করবেন; কবিতাটি প্রফেসরদের দৃষ্টি—আকর্ষণ করেছে।"

২য়,—"প্রফেসরদের খেয়ালের কথা বলতে গেলে······

৩য়,—"আহা রমাদেবী মিছে কেন ওকে উৎপাৎ কচ্ছেন। সুচিত্রা দেবীর সম্মুখে তার কোন সহপাঠীর প্রশংসায় ওরতো একটু হিংসে হবেই।

২য়,—"এতে কি থাকতে পারে? তবে অযথা প্রশংসা করছ তাই। তোমরা খাও পরের মুখে ঝাল। কবিতা সম্বন্ধে আইডিয়া আছে কারো?"

এবার সুচিত্রা মুখ খুলিল,—"কবিতাটি কি খুবই খারাপ হয়েছে বলতে চান আপনি?"

২য়,—"না খারাপ বলতে পারি না। তবে তেমন উচ্চ প্রশংসার কিছু দেখতে পাইনে। আমি মনে করি আমার কবিতাও যদি মেগাজিনে উঠ্‌তো বোধহয় নেহাৎ কম আদর পেতো না।"

"সুচিত্রা বলিল,—দেখুন জ্ঞান বেশী নেই। তাই বলে যে কিছুই বুঝি না এমনও নয়। আপনার কবিতাও আমরা পড়েছি।

তাতে উচ্চ প্রশংসাতো দূরের কথা, 'কলেজ মেগাজিনে স্থান না পাবার উপযুক্ত বলেই আমার ধারণা। এবং সত্যি সত্যি পায়ওনি।

দ্বিতীয় ছাত্রটির বদনখানি ঝড়ের পূর্ব্বে আকাশের ন্যায় থম্ থম্ করিতে লাগিল।

৩য়,—"ও নিয়ে আমাদের তর্কের কি প্রয়োজন। কি বলেন রমাদেবী? আসুন না একটু·····

. রমা,—"চলুন।" তাহারা দুইজন সম্মুখের রেষ্টুরেণ্টের দিকে অগ্রসব হইল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও অনেকেই তাহাদের অনুগমন করিল। সুচিত্রা একা পিছনে রহিল। দ্বিতীয় ছাত্রটি আগাইয়া আসিয়া কহিল,

—"যাক যা হয়ে গেছে গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি।" ও নিয়ে কিছু মনে করবেন না। আসুন একটু ·····

—"মাপ করবেন আমি রেষ্টুরেণ্টে যাই না। নমস্কার; তা হলে আসি।"

সুচিত্রা চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় ছেলেটি বোকার মতন দাঁড়াইয়া রহিল।

একুশ

অপরেশ আজ কলেজে আসিবার পথে হঠাৎ কলেজ আঙ্গিনার কিয়ৎ দূরে একদল ছাত্র ছাত্রীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। চতুর্দ্দিক হইতেই শব্দ উঠিল,—"নমস্কার অপরেশবাবু। কবি, পয়েট।"

অপরেশ ভারি লজ্জিত হইল। রমা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বলুনতো অপরেশবাবু, এ পর্য্যন্ত কতগুলো কবিতা লিখলেন?"

অপরেশ বিনীতভাবে উত্তর দিল,—"কৈ! কবিতা আর লিখলুম কোথায়?"

—"বলেন কি, তবে এই মেগাজিনেই প্রথম লিখলেন?"

অপরেশ অত্যন্ত নম্রভাবে উত্তর দিল,—"ও আবার একটা কবিতা!"

—"বিনয় মহাজনেরই শোভা পায়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনা যে এইটেই আপনার প্রথম কবিতা। কারণ অভ্যাস ব্যতীত প্রথমেই নির্ভুল লেখা সম্ভব নয়। সত্য বলুনতো আজ পর্য্যন্ত কি কি লিখলেন?"

—"বলুন এবয়স পর্য্যন্ত কত বই আমার লেখা সম্ভব?"

—"কেন রবীন্দ্রনাথতো ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখতেন। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে কাশীনাথ রচনা করেন। প্রতিভার স্ফুরণ ছোটবেলা থেকেই হয়।"

অপরেশ যুক্তকর মস্তকে ঠেকাইয়া বলিল,—ওঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। চাঁদের সঙ্গে জোনাকীর তুলনা করছেন।"

"—যাক্ সে কথা। কিন্তু কি কি লিখলেন না দেখে ছাড়ছিনা। আপাততঃ বলুনতো কয়খানা বই লিখেছেন?"

—"এইতো খানকয়েক।"

সুচিত্রা উহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। কিন্তু নিজে উহাতে যোগদান করেন নাই। অকারণে কেন যেন তাহার বাধিতে লাগিল। সে নীরবে এক কোণে বসিয়া সমস্ত শ্রবণ করিতে লাগিল।

রমা অপরেশকে প্রশ্ন করিল, "নাম বলুন না?" অপরেশ বলিল,—'এই ধরুন 'বনবীথিকা'।"

"—মানে, কাব্যতো?"

"—অবশ্য। তারপর 'মিনতি' 'অশ্রু'—এই কয়টি কবিতার। আর……"

জনৈকা সহপাঠিনী প্রশ্ন করিল,—"আর কি উপন্যাসও লেখেন নাকি?"

অপরেশ হাত কচলাইয়া নত বদনে বিনম্রভাবে উত্তর দিল,— "না আজেবাজে খান কয়েক লিখেছি। পড়ার উপযুক্ত নয়।" রমা প্রশ্ন করিল,—

—"নাম বলুন না?"

—"ত্যাগ, শেষপ্রার্থনা, পলাতকের ডায়েরী।"

রমা বলিল,—"আমি উপন্যাস পড়তে চাইনে। দয়া করে একটি কবিতার খাতা দেবেন। ঐ যে মিনতি না কি বললেন?"

অপরেশ লজ্জিত মুখে উত্তর দিল,—"আচ্ছা।"

"তাহলে আনবেন কাল?"

—"আনব।"

জনৈক ছাত্র বলিল,—"আমাকে তোমার উপন্যাস পড়তে দিওহে কবি?"

অপরেশ একটু মৃদু হাসিল। অনেকেই অপরেশের নিকট তাহার লিখিত খাতাগুলি পাঠ করিতে চাহিল। অনেকেই তাহার লিখিত কবিতা লইয়া তাহাকে কিছু বলিল। কিন্তু সুচিত্রা কিছু

চাহিল না বা বলিলনা। সুচিত্রার এই নির্বিকার ভাব দেখিয়া রমা আসিয়া প্রশ্ন করিল,—"তুই যে বড় নির্বিকার? এটা কিন্তু বড় ভাল লক্ষণ নয়।"

সুচিত্রা একটু মুচকি হাসিয়া রমার প্রতি কটাক্ষপাত করিল, "তোদের দাবীই তো মিট্‌ল না, আমি আর কি চাইব বল?"

—"তোর দাবী যেন একটু অসাধারণ হবে বলে মনে হচ্ছে? বেশ তুই এক কাজ করনা? কবিকেই চেয়ে বস্?"

—"কাউকে চাইতে হবে না। তার চেয়ে তুমি যে খাতাটি পড়তে নিচ্ছ, দয়া করে ঐটা একটু পড়তে দিও। তবেই সুখী হব।" সিটিং বেল পড়িল, কলরব করিতে করিতে ছাত্রদল কলেজে ঢুকিয়া পড়িল। অপরেশের এটা ছিল বাংলা ক্লাস। তাড়াতাড়ি সকলে আসিয়া হলে ঢুকিল। সকলের কলরোল বন্ধ করিয়া বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক বৃদ্ধ S. P. প্রবেশ করিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসর সকলকে বসিতে অনুমতি দিয়া 'রোলকলে' মনোনিবেশ করিলেন। 'রোলকলান্তে' চশমার ফাঁকে ছাত্রমহলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা তোমাদের মাঝে অপরেশ চট্টোপাধ্যায় কেহে?"

লজ্জিতভাবে অপরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রফেসর বলিলেন, "তুমি? বেশ্ বেশ্ বোস!"

অপরেশ উপবেশন করিলে প্রফেসর কহিলেন,—"Thank you my dear boy. আমাদের কলেজ মেগাজিনে তোমার কবিতাটি পাঠ করে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। দেখ, বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যের অবনতির যুগ। আজকালকার সাহিত্যিকেরা যে কি লেখেন আর কি বুঝেন, তা তারাই জানেন। রবীঠাকুরের কবিতার অর্থও অনায়াসে করতে পারি, কিন্তু এদের কবিতা বুঝবার সামর্থ্য আজও আমার হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতের প্রফেসরদের হবে। দেখ, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ ও তার

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগই রিয়্যাল কাব্যের যুগ গিয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যের উন্নতিতো হয়ইনি বরং যতদূর সম্ভব অবনতির দিকেই গিয়েছে।

যদিও যুদ্ধোত্তর যুগে নজরুল, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্রমিত্র প্রভৃতি কয়েকজন কাব্যের কিছুটা উন্নতি করেছেন। তাঁরা তাদের স্বাধীন মৌলিক চিন্তার প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তেমন সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেননি। তবুও তাঁদের গৌরব তাঁরা রবীন্দ্র আওতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্র প্রতিভার আত্ততায় পড়ে সে যুগের অনেক কবিই তাঁদের প্রতিভা সত্বেও খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারেননি। যাঁরা আজকের যুগে বার হলে হয়তো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তাই বলে সেদিনও তাদের লেখা কবিতা অবহেলিত হয়নি কখনও। যে কোন মাসিক পত্রিকা বার হলে প্রথমেই আমরা আগ্রহের সাথে দৃষ্টিপাত করতুম কবিতাগুলির উপর। সেদিন প্রত্যেক কবির লেখা কবিতাই আনন্দ যুগিয়েছে পাঠকদের। আর আজ? আজকালকার মেগাজিনগুলো বার হলে ভুলেও একবার দৃষ্টিপাত করতে ইচ্ছে করে না। তাদের না আছে—ছন্দ, না আছে ভাব—আর না আছে ভাষার মাধুর্য্য। কেনই বা হবে না? সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দরুনই এ সম্ভব হয়েছে। যার মোটেই ভাব নেই। সেও দশকবিতা থেকে দশটি পয়ার চুরি করে এনে জোড়া তালি দিয়ে রচনা করে ফেলে এক কবিতা, কবি খ্যাতির জন্য। কবি হওয়াটা কি এতই সহজ? কবির প্রাণ চাই অতি সরল। তাকে সর্ব্ব কুটিলতা এবং পার্থিব জিনিষ বিসর্জ্জন দিয়ে মিশে যেতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে। তাঁর সংসার হবে সন্ধ্যাকাশের মেঘ নিয়ে, নীল আকাশের চাঁদ নিয়ে, কাল বৈশাখীর ঝড় নিয়ে, ছোট নদীর ঢেউ নিয়ে!”

তিনি অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“তোমরাই লক্ষ্য করে দেখ, অপরেশ তোমাদের চাইতে অনেক ভিন্ন

প্রকৃতির। ওর মুখে মাখান রয়েছে এখনও গ্রাম্য সরলতাটুকু। ওর মাঝে যেন দেখা যাচ্ছে গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ওর দেহে গ্রাম্য শ্যামলতার কেমন এক মনোরম বিকাশ। তা' না হলে কি এমন কবিতা লেখা সম্ভব হয়।"

সকলেই অপরেশের দিকে তাকাইল; কিন্তু সুচিত্রার বদনখানি যেন আরও নত হইয়া আসিল। রমা সুচিত্রার ভাব ভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিল,—"কিরে বড় যে মাথা নিচু করে? লক্ষণ কিন্তু ভাল ঠেক্‌ছেনা।"

—"যাঃ।"

প্রফেসর বলিলেন, "দেখ অপরেশ, আমি তোমার কবিতায় প্রকৃত কবিতার স্বরূপ লক্ষ্য করেছি। সেখানে ছন্দ আছে, সেখানে ভাব আছে, সেখানে রস আছে। তুমি যেন একটা নূতন কিছুর আভাষ দিতে চাচ্ছ। তোমার রচনায় অনুকরণের প্রয়াস নেই। প্রতিভা নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, অনুকরণ তাঁদের জন্য নয়। আশাকরি বাংলার কাব্যযুগকে উন্নত করতে ভবিষ্যতে বিশ্বসাহিত্য দরবারে তুমি তাকে এক নূতন মর্য্যাদা দান করবে।"

ঘণ্টা শেষ হইল। নিয়মানুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে অপরাপর ক্লাসও শেষ হইল। ছাত্রছাত্রীর দল বাহিরে আসিল। সুচিত্রা সকলের পশ্চাতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। অপরেশও অযাচিত সম্মানে লজ্জায়, আনন্দে মন্থর গতি হইয়াছিল। ক্রমে সে সুচিত্রার নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া দুইপদ অগ্রসর হইল।

সুচিত্রা মৃদুস্বরে তাহাকে ডাকিল,—

—"শুনছেন?"

অপরেশ বদন নত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—আমায় ডাক্‌লেন?

সুচিত্রা মুখ টিপিয়া হাসিয়া নিঃশব্দে তাহার একটি খাতা বাড়াইয়া দিল।

অপরেশ প্রশ্ন করিল—মানে?

—সবারই আবদার রাখলেন আপনার কবিতা না হয় উপন্যাস পড়তে বলে, কিন্তু আমি কিছু চাইনি।"

অপরেশ কিছু বলিল না। বদন নত করিয়াই রহিল।

তাহার এই গ্রাম্য জড়তাটুকু দেখিতে সুচিত্রার খুব ভাল লাগে। সে বলিল,—একটি গান লিখে দেবেন?

—আমি!

—হ্যাঁ।

—আমার গান।

—কিছু শুনতে চাহি না।

চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া পলাইল। শুধু একটি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সহরের সকল ভ্যানিটি কোথায় ছুটিয়া গেল। সকল আভিজাত্যের ও সকল গর্ব্বের অন্তরালে যে গোপন প্রাণটি লুকাইয়াছিল নিমেষের জন্য সে ধরা দিল। এইখানেই প্রেমের বিচিত্র গতি। অতি বুদ্ধিমতি নারীও নিতান্ত বালিকা স্বভাবের হইয়া পড়ে। অতি বৃহৎ কুটিলও এখানে আসিয়া প্রেমের পরশে একান্ত কোমল না হইয়া পারে না অপরেশ একবার বদন তুলিয়া কিন্তু তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইল। মিনতি ভিন্ন অন্য কোন কুমারী নারীর প্রতি সে দৃষ্টিপাত করিবে না।

বাইশ

খ্যাঁদা দেখিয়া শুনিয়া অপরেশকে একটি ভাল মেস ঠিক করিয়া দিয়াছিল। মেসটি বড় লোকের আড্ডা। থাকা খাওয়া সকলই উচ্চ ধরণের। দীনেন্দ্র বাবু বলিয়া এক অতি অদ্ভুত ধরনের লোক ঐ মেসে থাকেন। তিনি কে, কি করেন? তাহা কেউ জানে না। তবে তাঁহার চালচলনে তিনি যে কোন অভিজাত শ্রেণীর হইবেন তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। বার্দ্ধক্যের সীমানায় আসিয়াও তিনি নিজের স্বাস্থ্যকে অটুট করিয়াছেন। নর প্রীতি মোটেই পছন্দ করেন না। তাহার দর্শনশাস্ত্রে মানবে দয়া মানে একটি প্রচণ্ড মুর্খতা। ভিখারীদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না সমাজের সকল সমস্যার সমাধান তাঁর মতে একমাত্র হত্যাব ভিত্তিতেই হইতে পারে। বলা বাহুল্য তাহার এই নর প্রীতি সত্বেও তাহারই সঙ্গে সকলের ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত বেশী। খ্যাঁদার সহিত তাহার পরিচয় অনেকদিন পূর্ব্বেরই এবং তাঁহারই অভিভাবকত্বে খ্যাঁদা অপরেশকে এই—মেসে রাখিয়াছে।

দিন কয়েক পরে অদ্য খ্যাঁদা মেসে আসিল। প্রথমেই সে দীনেন্দ্রবাবুর রুমে প্রবেশ করিল। দীনেন্দ্রবাবুকে খ্যাঁদা 'কাকাবাবু বলিয়া সম্ভাষন করিয়া থাকে। দীনেন্দ্রবাবু একমনে কি একটা বই পড়িতেছিলেন। খ্যাঁদা লক্ষ্য করিয়া দেখিল শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা। কাকাবাবু সম্বোধন পূর্ব্বক নিজের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া খ্যাঁদা তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। দীনেন্দ্রবাবু পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—

—খ্যাঁদা! আয় বোস।

উপবেশনান্তে খ্যাঁদা প্রশ্ন করিল,—

—নূতন মেম্বারটি কেমন হল কাকাবাবু?

—অপরেশের কথা বল্‌ছ ? অদ্ভুত, একেবারে অদ্ভুত। এবার আমার মনের মানুষ পেয়েছিরে খ্যাঁদা। শুনলুম ছেলেটি নাকি কবি ?

—এতদিন নিকটে থেকেও তা বুঝতে পারেন নি ?

তা আর বুঝিনি। প্রথম দেখাতেই বুঝেছি।

খ্যাঁদা বলিল,—কিন্তু আপনার মনের মানুষ তো ও মোটেই হ'বার কথা নয়।"

—কেন ?

—মানুষকে সর্ব্বান্তকরণে ভালবাসাই ওর ব্রত। কিন্তু আপনিতো তাদের সর্ব্বান্তকরণে ঘৃণা করেন।

দীনেন্দ্রবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—তাইতো এত মিলেছে। কিন্তু খ্যাঁদা একটা কথা।

—কি ?

—ওর মনে কোথাও যেন একটু গলদ আছে ক্ষনে ক্ষনে ওর অজ্ঞাতসারেও সেটা আমার নিকট ধরা পড়ে যায়।

খ্যাঁদা বলিল,—আপনি বুদ্ধিমান, অবশ্যই বুঝবেন। দীনেন্দ্র-বাবু প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু কি ?

খ্যাঁদার উত্তর দিবার সময় হইল না। বাহিরে—অপরেশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—

—কাকাবাবু আছেন ?

বলিয়া অপরেশ সেখানে প্রবেশ করিল।

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন,—এস অপরেশ, বোস! অপরেশ খ্যাঁদাকে দেখিয়া বলিল,—

—বারে খ্যাঁদা যে, কখন এলি। তুইও কাকাবাবুর শিষ্য হয়েছিস।

দীনেন্দ্রবাবু কপাল চাপড়াইয়া বলিলেন,—

—আমার দুর্ভাগ্য—আমার প্রিন্‌সিপল্ খ্যাঁদা মোটেই পছন্দ

করে না। আর ওর মত চঞ্চল লোক দিয়ে আমার—কার্য্যসিদ্ধি হবারও কোন আশা নেই।

খ্যাঁদা উল্টো অপরেশকে প্রশ্ন করিল,—

—শুনলুম তোর সঙ্গে নাকি কাকাবাবুর খুব ভাব হয়ে গেছে?
অপরেশ বলিল,—তোর সঙ্গেই কি ওঁর ভাব কম?

—ভাব কম নেই সত্যি। কিন্তু মতের মিল নেই।

আর আমার সঙ্গেই বুঝি মতের মিল হয়েছে? উনি হলেন মানব বিদ্বেষী, আর আমি······

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন,—

—আর তুমি মানব প্রেমিক এইতো?

অপরেশ বলল,—না ঠিক তা নয়, তবে মানব—প্রেমিকের শিষ্য বলতে পারেন।

—এবার থেকে না হয় মানব বিদ্বেষীরই শিষ্য হলে।

—কারণ দর্শাতে পারলে অবশ্যই হব!

তাহাদের মধ্যে এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে এমন সময় বাহিরে একজন ভিক্ষুকের সাড়া পাওয়া গেল,—চাট্টি ভিক্ষে হবে বাবু; আজ দুদিন কিছু খাইনি।

নিমেষে যেন দীনেন্দ্রবাবুর সর্ব্বগাত্রে আগুন ধরিয়া গেল,—জ্বালাতন করতে যতসব। আমি আমি············

তাঁহার মুখখানি ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল তিনি যেন কিছু খুঁজিতে ছিলেন। সম্ভবতঃ লাঠি জাতীয় কিছু হইবে। তাঁহার ভাবে মনে হতে লাগিল ভিখারীকে পারিলে বুঝিবা টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া ফেলিতেন। তিনি খ্যাঁদাকে বলিলেন,

—যাতো খ্যাঁদা দেখতো, বের করে দিবি। ঘাড় ধরে বের করে দিবি। যত সব জ্বালাতন, হতভাগার দল, যা তো শীগ্‌গীর যা।

তাহার কথার ভঙ্গীতে খ্যাঁদার হাসি পাইল।

খ্যাঁদা বলিল,—

আমি যাচ্ছি।

কিন্তু তাহার মনে এক দুষ্ট বুদ্ধি জুটিল। দীনেন্দ্রবাবু সত্যই কি তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিল। সে—বাহিরে আসিয়া ভিখারীকে আরও বেশী করিয়া চেঁচাইতে উৎসাহ দিল। বলিল সে যেন কিছুতেই ভয় না পায়, তবে তাহার মোটা বকশীস মিলিবে খ্যাঁদা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ভিখারীর চিৎকার বন্ধ হইল না।

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন,— কি? লোকটাকে তাড়াতে পারলিনে খ্যাঁদা সত্যনিষ্ঠ ছেলের ন্যায় উত্তর দিল,

—বললুম তো। কিন্তু কিছুতেই যাচ্ছে না।

—যাচ্ছে না। ব্যাটা বাপের সম্পত্তি পেয়েছে। রসো। তিনি উন্মাদের ন্যায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। খ্যাঁদা অপরেশকে ইসারায় নিকটে ডাকিল। উভয়ে গিয়া দরজার আড়ালে দাড়াইয়া গোপনে দীনেন্দ্রবাবুর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

দীনেন্দ্রবাবু বাহিরে আসিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাই?

ভিক্ষুক যদি দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই ভয় পাইল। ভিক্ষুক বলিল।

আজ চারাদিন কিছু খাইনি বাবু।

—খাওনি তো ভারি রাজ্য জয় করে এসেছে।

—বাবু?

—বাবু টাবু হবে না। বেরো। বেরো বল্‌ছি।

বাবু দীন্ দুঃখী বাবু—

দীনেন্দ্রবাবু বদন বিকৃত করিয়া বলিলেন,—

—দীন দুঃখী বাবু। ব্যাটা আমার ঢং। বাড়ীতে মেম্বার কয়জন?

ভিক্ষুক হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল,—

—আজ্ঞে সাত জন বাবু।

কাজ করে খেতে পারিস না ?—

—কাজ কোথায় পাব বাবু ?

পাবি কোথায় সেকি আমি বলে দেব। একটু ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন,—

—কাজ। কাজ তোদের জুটবে না ; কাজ তোদের মিলবে না, সারা ভারতবর্ষ ধনিকের দেশ ; এখানে গরীবের ঠাঁই কোথায়। গরীবকে কাজ দেবে কে। গরীবের ঠাঁই কোথায়। গরীবকে কাজ দেবে কে ? গরীবের ঘাড় ভেঙ্গে খেতেই সকলে ব্যস্ত। দরিদ্রের বুকের রক্তইতো ওদের বনিয়াদ ওরা করবে তোদের সাহায্য। ওরা দেবে তোদের কাজ ? ও পশুদের হাত থেকে রেহাই আছে ? রেহাই নেই, মুক্তি নেই মুক্তি পেতে হলে চাই রক্ত। শুধু চাই রক্ত। অত্যাচারীর বুকের শোনিত।

বলিতে বলিতে দীনন্দ্রবাবু এমন ভঙ্গিতে ভিক্ষুকের দিকে অগ্রসর হইলেন যে ভয়ে ভিক্ষুক দুই পদ পশ্চাৎ হাটিয়া গেল।

ভিখারী কাতর কণ্ঠে কহিল,

বাবু ?

হবে না হবে না। যা বলছি। তোদের বাঁচাতে যাওয়াই মুর্খতা—। ক্ষমতা থাকে আদায় করে নিবি। ভিক্ষা করবিনে। ভিখারী তবুও ডাকিল,—

—বাবু ?

—তবুও বাবু। হারামজাদা শুনতে পাসনে। পার্শ্বের ভগ্ন যষ্ঠী খণ্ড লইয়া তিনি ভিখারীকে তাড়া করিলেন। ভিখারী বেগতিক দেখিয়া পলায়নে তৎপর হইল। দীনেন্দ্রবাবু ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন কেউ কোথাও আছে কিনা। কোথাও লোকের চিহ্ন নাই।

—শোন।

ভিখারী লোকটিকে নেহাৎ বুঝি পাগলই ভাবিল। সন্দিগ্ধ মনে কহিল,—

বাবু?

—ভয় নেই!

তিনি পকেট হইতে ভিখারীকে একটি দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন! দীনেন্দ্রবাবুর ব্যবহারে ভিখারী একেবারে হতভম্ব।

নোটটি হাত পাতিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল, বলিল—বাবু?

—চুপ্ চুপ্ শিগগীর নিয়ে পালা। তিনি ভিখারীর হস্তে নোটটি গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে একরকম ঠেলিয়াই বাহিরে পাঠাইলেন।

খ্যাঁদা অপরেশকে ঠ্যালা দিয়া কহিল—দেখলি? —সত্যি ভারি অদ্ভুত লোক।

খ্যাঁদা কহিল—লোকে দান করে সহস্রলোকের মাঝে নাম করবার জন্য। আর উনি দান করেন গোপনে পাছে কেউ দেখে ফেলে। বলতো দাতা কে?

ভিখারীকে বিদায় করিয়া দীনেন্দ্রবাবু পুনরায় রুমে ফিরিয়া আসিলেন। খ্যাঁদা জিজ্ঞাসা করিলেন, —তাহলে তাড়ালেন ব্যাটাকে?

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন—তাড়াব না। বলিস্ কি?

ভিখারীদের আমি ছ'চক্ষে দেখতে পারিনা। যত সব আপদ জঞ্জাল।

অপরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—

—বুঝলি খ্যাঁদা। কাকাবাবু ভিখারীদের দেখতে পারেন না কিন্তু গোপনে গোপনে আবার দানও করে থাকেন। দীনেন্দ্রবাবু এমন ভঙ্গি করিয়া উঠিলেন যেন অপরাধীর সমস্ত অপরাধ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।

—না না তা হবে কেন? তুমি একি বলছ? ওর কথা বিশ্বাস করিস খ্যাঁদা?

খ্যাঁদা মাতব্বরী ঢংয়ে কহিল,—

—না না। আমি কি ওর কথা বিশ্বাস করি! যাক্ সে কথা। তাহলে নূতন মেম্বারটি ভালই হয়েছে কি বলেন কাকাবাবু?

—নিশ্চয়ই।

খ্যাঁদা বলিল,—ওকে একটু দেখবেন। একমাত্র আপনারই ভরসাতেই আমি ওকে এখানে রেখেছি। বড় আদুরে ছেলে। বিদেশে থাকার অসুবিধা মনে করে আসতেই চেয়েছিল না। ওর বাপই কি ওকে পাঠাতে চায়। আমিই না কত বলে কয়ে আপনার নাম করে নিয়ে এসেছি।

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন—না না সে তোমায় কিছু বলতে হবেনা। সে আমি দেখবোখন। আমি কি আর না দেখে পারি?

খ্যাঁদা বলিল,—আচ্ছা কাকাবাবু তাহলে আমি আজ আসি? ওকে একটু দেখে গেলাম। আমার আবার টিউসনি আছে।

এস। মাঝে মাঝে আসিস্।

—শ্রীমানকে. যখন রেখেছি,—তখন মাঝে মাঝে আসতে হবে বৈকি। নমস্কার। —খ্যাঁদা চলিয়া গেল।

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন,—ছেলেটা সত্যি ভাল।

তিনি অপরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

—তোমারতো কোন অসুবিধা হচ্ছে না অপরেশ?

—মোটেই নয়। বরং আপনার স্নেহযত্নে নিজের বাড়ী থেকেও সুখে আছি।

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন,—তোমার কোনো অসুবিধা হলে তৎক্ষণাৎ আমায় জানাবে।

অপরেশ হাসিয়া বলিল,—সে আর আপনাকে বলতে হবে না। আচ্ছা কাকাবাবু একটি প্রশ্ন করব?

—বল?

—প্রকাশ্য আর গোপন দানের মধ্যে কোনটাকে আপনার শ্রেয় বলে মনে হয়?

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন,—দানের দুটো মানে আছে, একটা দান, আর একটা মান। অন্তর থেকে সাহায্যের যে প্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় সেইটেই দান। স্বভাবতঃই—সেটা গোপনে হয়ে থাকে। আর সুযোগের প্রত্যাশায় দান করা সেটাকে মান বলা চলে, এবং সেটা প্রকাশ্যেই হয়ে থাকে। সুবিধা ও সম্মানের জন্য সে দানটা প্রকাশ্যেই প্রয়োজন।

অপরেশ বলিল,—আর একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—বল।

—দান করলে মিষ্টি মুখেই করা উচিৎ।

—উচিৎ তাই তবুও দানের পাত্রটিকে যাচাই করে নিতে হয়।

অপরেশ তাহার কথার প্রতিবাদ করিল। বলিল,—

—এবার আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না। কাকাবাবু, যারা প্রকৃত ভিখারী তাদের একটা অভিমান আছে। দরিদ্র বটে কিন্তু পরের অবহেলা তারা সইতে পারে না। কিন্তু যারা ভিক্ষার ভাণ করে তাদের ও সব গায়ে বাজেনা।

—তা নয় অপরেশ। যারা প্রকৃত ভিখারী তাদের মান অপমান বলতে কিছুই নেই। তাদের কোন অবলম্বন নেই। তাই কোন আঘাতও তাদের বাজেনা। আঘাতটা প্রতিহত হলে না লাগবে?

অপরেশ বলিল,—শুনছি মানুষের প্রতি নাকি আপনার একটা স্বাভাবিক ঘৃণা আছে সে কথা কি সত্যি?

দীনেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন,—

—সত্যি। মানুষের দেহে পৃথিবীতে কতকগুলো কি বাস করে জান? শয়তান! এ সংসার কেবল অত্যাচার আর ভুলে ভরা।

ভিখারী আসে ছলনা করতে। ধনী করে অত্যাচার। আর সাধারণ মানুষ তারা করে ভুল। আমার অভিযান এই তিনের বিরুদ্ধে। দান করতে হবে দানের পাত্র দেখে। ধনিকের অত্যাচার দমন করতে হবে বজ্র হস্তে। সাধারণ মানুষকে হতে হবে আত্মসচেতন মনুষ্য চরিত্র তুমি আজও অবগত নও অপরেশ। উপকার করলে লোকে কি ভাবে জান,—বোকা। উপদেশ দিলে ভাবে, জোচ্চোর। ভাই বলে ডাকলে ভাবে শত্রু। মনুষ্য চরিত্রের এই প্রতিদানের যে ভুক্তভোগী মাত্র সেই জানে এর কি জ্বালা।

তাইতো আজ মনে হয়। ঘৃণায় বিষিয়ে উঠি মানুষের উপর। উপকারী তার কৃতজ্ঞতা জানায় সর্পের চাইতেও ক্রুর হয়ে দংশন করে। তুমি জাননা, তুমি জাননা অপরেশ—বলিতে বলিতে হঠাৎ কাকাবাবু থামিয়া গেলেন।

—আমি মানুষকে ঘৃণা করিতে চাই। কিন্তু নিঃশেষে আজও তা পারি না। মনুষ্য চরিত্র যে দিন প্রকৃত উদ্‌ঘাটিত হবে তোমার নিকট, দেখবে সেদিন ঘৃণায়, লজ্জায় তোমার মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। জীবনে একদিন সবারই তা বুঝবার দিন এসে থাকে। তোমারও আসবে। আমি সেই সুযোগ্য মুহূর্ত্তে তোমায় জানাব আমি কে! কি করি! আমার উদ্দেশ্য কি!

একমাত্র যোগ্য মুহূর্ত্ত ব্যতীত সেই মন্ত্রে কাউকে দীক্ষিত করা যায় না।

অপরেশ বলিল,—আপনার মত একদিন আর একজন চেয়েছিলেন আমাকে দীক্ষিত করতে তাঁর মতে। তিনি ঠাকুর্দ্দা।

—তিনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আমার বিপরীত ছিলেন?

—সেইটেই আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

তেইশ

সুচিত্রার প্রাইভেট রুম হইতে বিস্তৃত রাজপথের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। সুচিত্রা ও রমা বসিয়া নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা করিতেছিল। হঠাৎ সুচিত্রার দৃষ্টি পথের উপর গিয়া পড়িল। দেখিল অপরেশ যাইতেছে। রমাকে ডাকিয়া বলিল,—ঐ ছাখ্। রমা তাকাইয়া দেখিল অপরেশ। সুচিত্রা বলিল,—

—দেখ্ কি আশ্চর্য্য। এতগুলো লোকের মাঝেও ওঁর স্বাতন্ত্রটি লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

রমা বলিল,—তুই কি মনে করিস ওঁর স্বাতন্ত্রটি ওর গৌরবের?

—নিশ্চয়।

রমা রহস্য করিয়া বলিল,—হতে পারে। প্রণয়াস্পদের সব কিছুই ভাল।

সুচিত্রা আরক্ত মুখে রমাকে একটি ধাক্কা দিল। রমা বলিল,—কিন্তু আমার ওটা কি মনে হয় জানিস? আমার মনে হয় আসলে ওটা ওর গেঁয়ো ভাব। বেশ। না হয় তাই হল। তুই এক কাজ কর দিকিন?

—আজ্ঞা হোক?

—যে ভাবে হোক্ ওকে এখানে ধরে নিয়ে আসবি। কিন্তু এটা যে আমাদের বাড়ী এ কথা বলিস না কিন্তু।

রমা বলিল,—কারণ?

—না হয় একটু চা-ই খাইয়ে দিতুম।

—ও কিন্তু চা খেয়ে ভুলবার পাত্র নয়!

—সে আমি জানি।

রমা বলিল,—তবে? জমিদার কন্যায় আভিজাত্য আর দৌলতের চাকচিক্য দেখবার জন্য?

সুচিত্রা উত্তর দিল,—আমি জানি ধনকে ওরা তুচ্ছ বলেই জানে?

—তবে?

সুচিত্রা বলিল,—সে দিয়ে তোর প্রয়োজন? তুই যাবি কিনা তাই বল?

রমা হস্ত উল্টাইয়া বলিল,—রাজ কুমারীর যখন আদেশ তখন যেতেই হবে, কিন্তু গিয়ে কি—বলব? বলব রায়বাহাদুরের কন্যা সুচিত্রা দেবী আপনাকে স্মরণ করেছেন?

—দৌত্যের কাজ যে তোমাকে শেখাতে হবে না সে আমি জানি।

—কিন্তু দৌত্যের পুরস্কার কি মিলবে?

—পুরস্কার? সুচিত্রা রমার কর্ণ ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিল। রমা বলিল,—এ পুরস্কারটা আমায় না দিয়ে অপরেশ বাবুকে দিলে তিনি আরও সন্তুষ্ট হবেন।

রমা দ্রুতপদে নিম্নে নামিয়া আসিল। সুচিত্রা অপলক দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। চতুর্দ্দিকে কেমন অবাক দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে অপরেশ যাইতেছে। তাহার ঐ সরল চাহনিই সুচিত্রাকে মুগ্ধ করিয়াছে। অপরেশ এইবার ট্রাম ষ্টপেজের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঞ্ছিত ট্রাম দেখা যাইতেছে না। অপরেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। রমা পেছন হইতে আসিয়া ডাকিল,—কবি।

কথাটি অপরেশ ঠিকই শুনিল, কিন্তু তাহাকে কেহ কবি বলিয়া ডাকিতে পারে,—এ ধারনা তাহার ছিল না। সুতরাং সে দৃষ্টি ফেরান প্রয়োজন বোধ করিল না। রমা পুনরায় ডাকিল, —অপরেশবাবু?

এইবার অপরেশ ফিরিয়া তাকাইল। রমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই আঁখি নত করিল। কারণ কোন কুমারী নারীর মুখসে

দেখিবে না। দেখিবেনা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও এই চঞ্চলা মেয়ে রমার বদনখানি তাহাকে বহুবার দেখিতে হইয়াছে। কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে একমাত্র রমার মুখ খানিই তাহার নিকট পরিচিত। বদন নত করিয়াই অপরেশ বলিল—আমায় ডাকলেন?

—ডাকলুম। আসুন না একটু।

অপরেশ নিতান্ত সরলচিত্ত শিশুর ন্যায় উত্তর দিল,—কোথায়?

সুচিত্রাদের বিরাট অট্টালিকার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া রমা বলিল,—যদি বলি ঐ রাজবাড়ীতে?

অপরেশ সেই বিরাট্ বাড়ীটির দিকে তাকাইয়া বলিল,—ওটা বুঝি আপনাদের বাড়ী?

—আজ্ঞে না। তবে আপনারই গুণমুগ্ধা কোন ধনী দুহিতার বাড়ী।

অপরেশ বলিল,—আমার সঙ্গে কোন ধনী দুহিতার তো পরিচয় নেই।

—আছে কিন্তু মনে পড়ছে না। ওখানে গেলেই চিন্‌তে পারবেন।

অপরেশ বলিল,—কিন্তু আমি যে এখন……

রমা তাহার বাধা দিয়া বলিল,—কোথাও যাচ্ছেন, এইতো? কিন্তু তার পূর্ব্বে আপনাকে একবার ওখানে যেতেই হবে।

রমা আর কোন বাক্য না ব্যায় করিয়া অপরেশের হস্ত ধরিয়া তাহাকে বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে বিরাট্ বাড়ীটির দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

সুচিত্রা কিন্তু পূর্ব্বাপর সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল, যখন দেখিল রমা সত্য সত্যই তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিতেছে, তখন কোন্ এক অজানা সঙ্কোচ তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

সিঁড়িতে দ্রুত পা ফেলিয়া ধুপ ধাপ্ শব্দ করিতে করিতে রমা অপরেশকে লইয়া সুচিত্রার কক্ষে প্রবেশ করিল।

দেখ্‌তো যার কথা বলেছিলি তাকেই ধরে এনেছি কিনা ?

সুচিত্রা একটু মৃদু হাসিল। অপরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—বসুন !

অপরেশ একবার মুখ তুলিয়া তাকাইতে গিয়াও বদন নত করিল। কুমারী যুবতীর মুখ সে দেখিবে না। অপরেশ বসিল। রমা অপরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—রাজকন্যাকে চিনলেন্ ?

অপরেশ রাজকন্যার কণ্ঠস্বরেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে সুচিত্রা। অনেকের মুখেই সে সুচিত্রার কথা শুনিয়াছে। সে নাকি অসামান্যা সুন্দরী। একজন বুদ্ধিমতী ছাত্রী। উন্নত চরিত্রা। সে ধনীর কন্যা। কিন্তু অপরেশকে এখানে ডাকিয়া আনিবার কি মানে ?

রমা বলিল,—আপনি কিন্তু সত্য সত্যই কলেজের সবার ঈর্ষার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

অপরেশ নত বদনেই উত্তর দিল, কেন ?

—কেন আবার। লেখাপড়ায় হিরের টুকরো। রূপে প্রফেসরের বর্ণানার বস্তু। সহপাঠীদের অবশ্য হিংসে হবেই। কিন্তু আপনার চোখ দুটিই নাকি সব চাইতে মারাত্মক। তাই বুঝি সবার দৃষ্টি থেকে চোখ ঢেকে রাখতে অমন নত করে রাখেন ?

অপরেশ লজ্জিত হইয়া বলিল,—ওটা আমার অভ্যাস।—

—আপনার চোখ কি একটু খারাপ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুচিত্রা বলিল,—আমার কিন্তু মনে হয়, খারাপ হয়ে যাওয় ভয়েই উনি তাকান না।

অপরেশ প্রশ্ন করিল,—কেমন ?

সুচিত্রা বলিল,—অনেক সন্ন্যাসী আছেন সাধনা ভঙ্গ হবার ভয়ে যাঁরা অমন করেন থাকেন। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মমতে তাঁরা নিকৃষ্ট সাধক। সংসারে থেকে আপনার পবিত্রতা রক্ষা করে

চলাই প্রকৃত পৌরুষের পরিচয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

রমা বলিল,—

—কিন্তু আমার ওটা কি মনে হয় জানিস? ওটা ওর গ্রাম্য সঙ্কোচ।

সুচিত্রা বাধা দিয়া বলিল,—মোটেই নয়। ওটা ওর কুসংস্কার।

অপরেশ অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিল। সুচিতার প্রত্যেক কথাটি তাহার অন্তর বিদ্ধ করিতেছিল। সে বলিল,—আমাকে কি এই শোনাবার জন্যই ডেকে আনা হয়েছে?

সুচিত্রা উত্তর দিল,—মোটেই নয়। যদি কিছু প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে থাকি ক্ষমা করুন। কিন্তু যারা প্রতিভাশালী ব্যক্তি, তাঁদের দেখবার, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবার কার না ইচ্ছা হয় বলুন?

অপরেশ বলিল,—কিন্তু যতগুলি শব্দ আপনি ব্যবহার করলেন সব গুলোই আমার চরিত্রের বিপরীত।

সুচিত্রা বলিল, সত্যি বিনয় মহত্বের একটি গৌরান্বিত অঙ্গ।

অপরেশকে যেন কথাটি বলিয়া হার মানিতে হইল।

রমা তাহাকে প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা অপরেশবাবু কবি আর সাধারণ মানুষে তফাৎ কোথায়?

অপরেশ রহস্য করিয়া বলিল,—হয়তো দেহে।

রমা বলিল,—সত্যি।

—সত্যি নয়তো কি মিথ্যে? দেখুন আপনারা আমাকে যাঁচাই না করেই কবি বলে ধরে নিলেন। সেকি দেহ দেখেই নয়?

সুচিত্রা বলিল,—আপনি ঠাট্টা করছেন?

—মোটেই নয়। আর আপনাদের কথার ভাবে আমার কথাটি কি নিতান্তই নিরর্থক হয়েছে?

সুচিত্রা উত্তর দিল,—মোটেই নয়। সত্যি, দেহেই কবি

সাধারণের চেয়ে অনেক পৃথক থাকেন। কিন্তু এই দেহটা কি? মনের বিকাশ। হয়তো কথাটা একটু ভুল হয়। মনের বিকাশ' এই কথাটি মানান সই হয়নি, তবুও দেহের ছন্দ ও তার সৌন্দর্য্য, তার দীপ্তি, সবই নির্ভর করে মনের রুচির উপর। এদিক থেকে দেহেই যে পার্থক্য, একথাটা মোটেই ভুল হয়নি। জানেন, লোকের মুখ দেখেই বলে দেওয়া যায় যে লোকটি শয়তান কি সৎ। আপনার ভিতরকার কবি প্রতিভাটিও এমনি করেই আমাদের নিকট ধরা পড়েছে। আপনি যতই বিনয়ী হন না কেন?

অপরেশকে পূনর্বার এই মেয়েটির নিকট হারিতে হইল।

বুঝিল যে উহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিল, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। সুচিত্রার প্রতি তাহার মনে কোমল একটা মৃদু প্রীতি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে আজ কঠিন পাষাণ, কাহারও মুখের প্রতি সে তাকাইবে না।

সুচিত্রা বলিল,—আপানার চা পানের অভ্যাস আছে তো? না যার তার হাতে জলস্পর্শ করেন না? আমরাও কিন্তু ব্রাহ্মণ।

অপরেশ লজ্জিত হইল। আপনার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের গোপন তথ্যটুকুও যেন ঐ মেয়েটির নিকট ধরা পড়িয়াছে। বলিল,—না, তেমন কোন প্রেজুডিস্ নেই।

সুচিত্রা বলিল,—কিন্তু না বলে ভরসা হচ্ছিল না। হয়তো খাবার বেলা কোন প্রেজুডিস নেই, কিন্তু অন্য দিকে আছে কিনা কে জানে। তা হাতে খেলে কৃতজ্ঞ হতে হয় একথা জানেন তো?

অপরেশ বলিল,—কবিরা তো অকৃতজ্ঞ নয়। স্নেহ প্রীতি, ভালবাসা পৃথিবীতে এইতো তাদের চিরদিনের কামনার বস্তু।

সুচিত্রা বলিল,—আমরাও তাই জানতুম। কিন্তু আপনার বেলায় তার কিছু ব্যতিক্রম আছে।

অপরেশ বলিল,—সত্যি! কিন্তু তারও কারণ আছে; আমি পূর্ণাঙ্গ কবি নই।

সেই গুপ্ত রহস্যটুকু আজো ভেদ করতে পারিনি।

অপরেশ প্রশ্ন করিল,—কিন্তু সে গুপ্ত রহস্য ভেদ করে আপনার লাভ?

নিমেষে সুচিত্রা যেন একটু রক্তিমাভ হইল। নিজেকে আহত বোধ করিল। কিন্তু পড়িয়া যাইতে যাইতে বুদ্ধিমতী মেয়েটি টাল সামলাইয়া লইল। বলিল,—লাভ অবশ্য কিছুই নেই। কিন্তু ওটা মানবের চিরন্তন স্পৃহা কিনা।

অপরেশ বুঝিল কথায় এই মেয়েটিকে পরাজিত করা তাহার সাধ্য হইবে না। বলিল,—দেখুন আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সুচিত্রা বলিল,—সে আমি বুঝি। কিন্তু এসেছেন যখন, একটু দেরী করুন।

সে নিজের হাতে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। তড়িৎকর্ম্মা মেয়ের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে চা প্রস্তুত করিয়া সে বন্ধুও বান্ধবীকে চা পানে আপ্যায়িত করিল। চা পানান্তে অপরেশ বলিল,—তা হলে এবার আসি।

রমা বলিল—আর একটু বসুন, আমিও যাব। তবে একটা গান না শুনে নড়ছি না!

সুচিত্রা লজ্জিতা হইয়া বলিল: মানে?

—মানে হারমনিয়মটা একবার বের কর।

—হয়তো উনি পছন্দ করবেন না।

—সত্যি? রমা অপরেশের দিকে তাকাইল!

—না না। বেশ তো, গান না।

সুচিত্রা হারমনিয়মটা টানিয়া আনিল। সে গাহিল, অপরেশেই লেখা সেই গানটি। তন্ময় হইয়া অপরেশ শুনিল। তারই অন্তরের বাণীকে যেন জীবন্ত রূপ দিয়াছে সুচিত্রা। এবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া থামিয়া গেল। গানের শেষে একটা প্রত্যাশা লইয়া সুচিত্রা অরপরেশের দিকে তাকাইল। কিন্তু সে বদন নত করিয়াই আছে। রমা উঠিয়া দাঁড়াইল: এবার তাহলে আসি? অপরেশও

উঠিয়া দাঁড়াইল। নমস্কার। আসি। তাহার বদন তখনও নতই রহিয়াছে। সুচিত্রা স্মিত হাস্যে নমস্কার করিয়া বলিল,—আসুন।

রমাও বিদায় লইল। তাহারা উভয়ে সিড়ি বাহিয়া অবতরণ করিয়ে লাগিল। রমা অগ্রে নামিতেছিল। হঠাৎ একবার সুচিত্রা কি ভাবিয়া অপরেশকে ডাকিল,—

—শুনুন।

রমা ততক্ষণ নীচে নামিয়া গিয়াছে। অপরেশ মুখ না তুলিয়া পিছনে না তাকাইয়া উত্তর দিল,—বলুন?

তাহার এই অবজ্ঞায় সুচিত্রা একটু আঘাতই পাইল সে। যাহা বলিতে চাহিয়াছিল তাহা চাপিয়া গেল। বলিল,—আপনি কখনও আমাদের দিকে ফিরে তাকাতে পারেন না?

অপরেশ অনেকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দিল—না।

কথাটি যেন সুচিত্রার বুকে শেল বিঁধিল। অপরেশ ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। সুচিত্রা পাষাণ প্রতীমার ন্যায় নিশ্চল হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আঁখি দুইটি যেন স্থির হইয়া গিয়াছে। অপরেশের গমন পথে সে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। ক্ষণপরে দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইলে সুচিত্রা একটি বিরাট্ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

চব্বিশ

খ্যাঁদা মেসে অপরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল। সে অপরেশের রুমে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় অপরেশের লেটার বক্সের উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিল একটি চিঠি। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, অপরেশের নিকটই আসিয়াছে। খ্যাঁদা পাঠ করিল। তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। মিনতির বিবাহ ঠিক হইয়াছে। এখন উপায় ? একথা অপরেশকে কোন মতেই জানান যাইতে পারে না। খ্যাঁদা পত্রটি লুকাইয়া ফেলিল। দুই পদ অপরেশের গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিল। না, অপরেশের সহিত আর তাহার দেখা করা হইল না। তাহাকে এখনই দেশে রওনা হইতে হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে গিয়া গ্রামে পৌঁছান চাইই।

বাসায় আসিয়া মাকে নাম মাত্র জানাইয়া, তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই খ্যাঁদা বাহির হইয়া পড়িল। তখন প্রায় সন্ধ্যা।

শিয়ালদহ আসিয়া সে গোয়ালনন্দগামী ঢাকা মেলের টিকিট কাটিল। যথা সময়ে সে ট্রেনে চাপিয়া দেশে রওনা হইল।

গ্রামে আসিয়াই খ্যাঁদা বরাবর মিনতিদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। মিনতির পিতা বেনু চট্টোপাধ্যায় উঠানে শাক-শব্জীর তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ঠাকুর্দ্দার পুত্র হইয়া তিনি কোন চাকুরীর মোহে না পড়েন, তাহার প্রতি ইহাই ছিল তাঁর শেষ নির্দ্দেশ। বেনুবাবুও পিতার অনুরূপ গাঢ় হিন্দু হইয়াছেন। ঠাকুর্দ্দা আর যাই থাকুন মনটাতে পুরো আধুনিক ছিলেন! কিন্তু বেনুবাবু বাহিরেও যেমন তিনবেলা আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ

করেন না, তদ্রূপ মনেও পুরানো যুগের অনেক অযৌক্তিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

খ্যাঁদা বরাবর বেনুবাবুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বেনুবাবু বলিলেন,—একিরে খ্যাঁদা যে! কবে এলি? ভালতো? খ্যাঁদা তাঁহার সহিত কুশল বিনিময় করিল

বেনুবাবু বলিলেন,—আয়, আয়, এ ঘরে এসে বোস্। তিনি খ্যাঁদাকে কাছারী ঘরে আনিয়া বসাইলেন এবং নিজে কল্কে লইয়া ধূমপানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুরুক্ ভুরুক্ শব্দ উত্থিত হইল। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—বাসার সব ভাল আছে তো?

খ্যাঁদা নম্রস্বরে উত্তর দিল,—আজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদে আছেন কোন প্রকার।

বেনুবাবু হুঁকায় একটি দীর্ঘ টান দিয়া বলিলেন,—বেশ।

খ্যাঁদা দেখিল, সে যাহা বলিতে আসিয়াছে, তাহার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। তাই বলিল: শুনলুম, মিনতির বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গেছে?

—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে একটা সম্বন্ধ ঠিক করেছি।

—কথাবার্ত্তা সব পাকাপাকি হয়ে গেছে?

—তা গেল সোমবারের আগের সোমবার হয়ে গেছে।

খ্যাঁদা যেন আঘাত পাইয়া বলিল,—

হয়ে গেছে?

বেনুবাবু বলিলেন,—হ্যাঁ। কিন্তু বল্‌তো তুই অমন করে উঠলি কেন?

খ্যাঁদা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—না, ও কিছু নয়। কিন্তু ছেলে কোথাকার?

বেনুবাবু যেন গৌরবের সহিতই পাত্রটির পরিচয় দিলেন,—কাশীপুরের নটবর মুখুয্যের ছেলে নিতাই মুখুয্যে।

খ্যাঁদা যেন আঁতকাইয়া উঠিল,—এ্যাঁ! বলেন কি! ওযে পঞ্চাশ বছরের বুড়ো।

বেনুবাবু বলিলেন,—ছিঃ ওকথা বল্‌তে আছে? বুড়ো কোথায়, এইতো সেদিনের ছেলে।

—কিন্তু।

বেনুবাবু বলিলেন,—কিন্তু কি?

খ্যাঁদা বলিল,—আমি একটা কথা বল্‌তে চাই, যদি কিছু মনে না করেন।

বেনুবাবু বলিলেন,—অবশ্য বলবে। বল?

খ্যাঁদা ধীরে ধীরে বলিল,—মিনতির মত আছে?

—কেন থাকবে না?

—কিন্তু সব কিছু জেনেশুনে বিয়ে ঠিক করা উচিৎ ছিল আপনার।

বেনুবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—তুমি কি বলতে চাও?

—ধরুন এমনও তো হতে পারে যে, এ বিয়েতে আপনার মেয়ের মত নেই।

বেনুবাবু যেন তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন,—মত নেই? আমার মেয়ের মত নেই। বেনু চট্টোর মেয়ে তেমন হতেই পারে

মুখ সামলে কথা বল্ খ্যাঁদা। হ্যাঁ মুখ সাম্‌লে।

মিছে রাগ কচ্ছেন বেনুকাকা। আগে সবটা শুনুন?

—এ বিষয়ে আমার কিছু শুনবার প্রয়োজন নেই।

খ্যাঁদা বলিল,—আমার মনে হয় আপনার মেয়ে স্বয়ম্বরা।

বেনুকাকা প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল,—সাবধান খ্যাঁদা। সাবধান বলছি। বেনুকাকা ক্রোধে বিবেক হারাইয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বেরো। আমার বাড়ী থেকে শিগ্‌গীর বেরো ছোটলোক কোথাকার।

খ্যাঁদা নম্রভাবে বলিল,—শুনন, অধৈর্য্য হবেন না।

—কিছু শুনতে চাই না। তুই বেরো, বেরো বলছি আমার বাড়ী থেকে।

খ্যাঁদা বলিল,—আপনার কন্যা অপরেশকে ভালবাসে। বেনুবাবুর চক্ষুদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—ষড়যন্ত্র। সব ষড়যন্ত্র। আমার মেয়ের নামে মিছে কলঙ্ক রটাতে এসেছে। বদ্‌মায়েস পাজি কোথাকার। বেরো, বেরো!

খ্যাঁদা বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল,—আমায় অপমান করুন, কিছু মনে করব না, শুধু একবার ওদের কথা ভাববেন। ক্ষণিকের ভুলে দুটি জীবন নষ্ট করবেন না। এই আমার প্রার্থনা।—

বেণুবাবু রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিলেন।

ক্ষুন্নমনে খ্যাঁদা অপরেশদের বাড়ীতে চলিয়া আসিল। উদ্দেশ্য জিতেনবাবুকে বলিয়া যদি কিছু করা যায়। কিন্তু দেখিল জিতেনবাবু গৃহে নাই। বাড়ীতে শুধু অপর্ণা ও অভিভাবিকা স্বরূপা দূর সম্পর্কীয়া এক দিদিমা রহিয়াছেন।

অপরেশ যে ঘরটিতে থাকিত খ্যাঁদা নিঃশব্দে সেই ঘরে আসিয়া বসিল। অপর্ণাকে দেখা দিবার ইচ্ছা তাহার নাই। কিন্তু অপর্ণার চক্ষু সে এড়াইতে পারিল না। অপর্ণা দেখিল বিষন্নমনে খ্যাঁদা আসিয়া অপরেশর ঘরে বসিল। ধীরে ধীরে সে নিকটে আসিয়া শুধাইল—একি খ্যাঁদ্‌দা যে? কবে এলে? বড় মন মরা হয়ে বসে আছ যে?

খ্যাঁদা অমনি পূর্ব্বের চটুলতা ফিরাইয়া আনিয়া বলিল,—মন মরা কোথায়? একটু কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

—কিন্তু এসে তো আমায় ডাকলে না? দাদা কেমন, তাঁর কথাও তো কিছু বল্‌লে না?

খ্যাঁদা বলিল,—ভালই আছে।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—দাদা খুব মন খারাপ করে থাকেন না?

খ্যাঁদা বলিল,—খ্যাঁদা যার বন্ধু তার কখনও মন খারাপ হতে পারে?

অপর্ণা বলিল,—অশ্রু এলেও অন্তত লুকোতে শিখ্‌বে নয় কি?

কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে কথাটি বলা হইয়াছে খ্যাঁদার বুঝিতে বাকী রহিল না। বলিল,—

—অবশ্যই! আর সেইটেই তো পুরুষত্ব।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—কিন্তু নারীত্ব কোন্‌টা সেইটে বল্‌তে পার?

সহিষ্ণুতা নারীত্ব। আর সেইটেই নারীর গুণ যা পুরুষকেও হার মানিয়েছে।

—সহিষ্ণুতাই যদি নারীর গুণ, তবে সব কিছুই কি তাকে সহ্য করতে হবে?

—খ্যাঁদা বলিল, কেমন?

—ধর এই অন্যায়।

—না অন্যায়কে কখনও আমি সহ্য করতে বলি না। তবে হৃদয়ের ক্ষনিক দৌর্ব্বল্য গুলিকে জয় করবাব কথা বল্‌ছি। আর এই দিক থেকে যে তারা খুবই সুনিপূনা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সত্যি, ভেবে কুল পাইনা কি দিয়ে নারীদের হৃদয় গঠিত, যাতে এত দুঃখ অনায়াসে বুক পেতে সইতে পারে। বুক পুড়ে গেলেও যাদের মুখের হাসি কখনও শুকায় না। বুক ফেটে গেলেও যাদের মুখ ফোটে না।

অপর্ণা বলিল,—এইটেই নারীর যাদু। তারা যে কুহকিনী এই কথাটি ঠিক।

খ্যাঁদা উত্তর দিল,—নারী যাদুও জানে না, তারা কুহকিনীও নয়। তারা দেবী।

অপর্ণা বলিল,—নারীর হৃদয় পাষানে গড়া, নয় খ্যাঁদাদা?

—নারী স্নেহময়ী তাদের হৃদয় পাষান হতে যাবে কেন?

—নইলে সহজ আঘাতে তারা কেন ভাঙ্গে না? আর বুকে—আঁচর পড়লে কেন তা সহজে মুছেও না? এগুণ তো একমাত্র পাষাণেরই আছে।

খ্যাঁদা বলিল,—সত্যি অপা, তোর এই উপমার কাছে আমিও হার মনিতে বাধ্য হচ্ছি।

অপর্ণা কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,—আজকের হারটা চিরদিন মনে রেখ।

খ্যাঁদা প্রশ্ন করিল,—মনে না রাখাই কি ভাল নয়?

—কেন? মনে রেখে শ্রদ্ধা ভক্তি করবার ক্ষমতা সেইটেই কি বড় নয়?

—আমি যদি শিল্পী হতুম তবে না হয় তুলির ডগায় যাকে শ্রদ্ধা করি তাকে এঁকে রাখতুম।

অপর্ণা একটু মৃদু হাসিয়া বলিল,—শুধু একটি জিনিষ, যার কাছে কবির কবিত্ব, শিল্পীর শিল্প সকলই হার মেনেছে। শত কাব্য, শত গান, শত রূপ, শত প্রাণ এখানে এসে ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর কাছে হার মেনে যেতে বাধ্য হয়। আচ্ছা নারীর জন্ম কেন? একথা বলতে পার?

খ্যাঁদা ধীরে ধীরে কহিল,—বোধ হয় সেবার জন্য।

অপর্ণা বলিল,—সত্যি তাই। তারা এই দেহটাকে—বিলিয়ে দেয় কেবল সেবারই জন্য। পরের মনস্তুষ্টির জন্য আপনার ভাঙ্গা মন নিয়েও তারা এমন নিপুনভাবে কাজ করে যেতে পারে যে, লোকের চোখে সেগুলো ধরাই পড়ে না। তাদের স্বভাবজাত ঐ দেহের চাকুরীটাকেও লোকে মনের মাধুরীর সঙ্গে মেশান বলেই গ্রহণ করে। আর সেই মুহূর্ত্তে যোগ্য অভিনয় করতে তাদের একটুও ভুল হয় না! নারীর সবচেয়ে গৌরব তারা নিজেকে বঞ্চনা করতে জানে। কি আশ্চর্য্য! তোমার মাঝেও সেই গুণটিই দেখ্‌তে পাচ্ছি খ্যাঁদ্‌দা।

—তুই দেখ্‌ছি অন্তর্যামী। মনের সকল কথাই জানতে পারিস।

অপর্ণা বলিল,—যদি বলি যাদু করে জানতে পারি?

—যাদু নয়, অপনার স্বাভাবজাত—মহিয়সী গুণে।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা খ্যাঁদ্‌দা নারীদের সম্বন্ধে তোমার খুব উচ্চ ধারনা নয়?

খ্যাঁদা উত্তর দিল,— থাকতো উচিৎ। না থাকলেও সে ধারণা আরও গাঢ়তর হয়েছে এক নারীর সঙ্গে পরিচয়ে। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত হয়তো সেই মুর্ত্তিটিই অঙ্কিত থাক্‌বে আমার বুকে।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—সেই মহিয়সী নারীটিকে যদি তুমি কখনো না পাও, আঘাত পাবেনা?

—তাকে পাবার কথা কোনদিন চিন্তা করিনি। তাকে—শুধু ভালই বেসেছি, শ্রদ্ধাই করেছি। শ্রদ্ধা করবার একটা উদগ্র বাসনাই পোষন করেছি।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা খ্যাঁদ্‌দা তুমি কখনও বিয়ে করবে না?

—হয়তো করবো। নইলে নারীর সেবা পাব কোত্থেকে, তাকে আরও গভীর ভাবে সম্মান করব কেমন করে?

—তুমি তাকে ভালবাসতে পারবে?

—না।

—তবে কি তাকে বঞ্চনা করা হবে না?

—কেন? আমি তাকে ভক্তি করব, শ্রদ্ধা করব। আর তুই তো বল্‌লি নারী জন্ম সেবার জন্য।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা খ্যাঁদ্‌দা পূর্নিমার চাঁদই ভাল না অমাবশ্যার অন্ধকারই ভাল? সত্যিকারের জিনিষ থাকে কোথায়?

—আলো এবং আঁধার দুইয়েরই মাঝে। কিন্তু তুই এখন যা অপা। আমার সঙ্গে একা গল্পকরা তোর ভাল দেখায় না।

অপর্ণা একবার মাত্র খঁ্যাদার মুখের দিকে, জীবনের প্রথম নূতন ভাবে দৃষ্টিপাত করিল। উভয়ের আঁখিতে মিলন হইল। অপর্ণা চলিয়া গেল। দুইটি চটুল দেহের অন্তরালে যে দুইটি মধুর শান্ত প্রাণ ঘুমাইয়া ছিল ক্ষনিকের জন্য একদিন পৃথিবীর বুকে উভয়ে উভয়ের নিকট ধরা দিল। হয়তো আর কেহ তাহাদের এই কথা জানিবে না, তাহাদের যথার্থ মনের পরশ পাইবে না।

পুনরায় খঁ্যাদা নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর জিতেন-বাবু সেখানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বদনখানি কোন একটা ক্ষোভে বিরক্ত দেখাইতেছিল। খঁ্যাদা উঠিয়া জিতেনবাবুকে প্রণাম করিল। জিতেনবাবু ভাল মন্দ কিছুই উচ্চারণ করিলেন না।

খঁ্যাদাই প্রথম প্রশ্ন করিল,—ভাল আছেন কাকাবাবু? জিতেনবাবু উত্তর দিলেন—হু, কিন্তু এখানে কি মনে করে?

তাহার কথার ভঙ্গীতে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব খঁ্যাদার নিকট ধরা পড়িল। কিন্তু সে উহা গ্রাহ্য না করিয়াই বলিল—

—একটা কথা বলতে চাই।

জিতেন বাবু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন,—বল?

—শুনলুম মিনতির নাকি বিয়ে হচ্ছে?

—হচ্ছে। কিন্তু তাতে তোমার কি?

খঁ্যাদা বুঝিল যে জিতেন বাবুর নিকট সকল রহস্যই ধরা পারিয়াছে। তবুও বলিল,—

—কিন্তু এ বিয়ে তো হতে পারে না?

—জানি। আর তাই নিয়ে বেনুদার সঙ্গে অনেকক্ষণ সুপারিশ করে এসেছ। কিন্তু আমার ছেলের হয়ে তোমাকে সুপারিশী করতে বলেছে কে? অপরেশ এমন কোনদিন ছিলনা খঁ্যাদা। আমার মনে হয় কোন কুসংসর্গে পরে সে নষ্ট হচ্ছে, কেউ তাকে এমন জঘন্য কার্য্যে উৎসাহ দিচ্ছে।

খ্যাঁদা বলিল,—এ আপনার অন্যায় সন্দেহ কাকাবাবু, আর তা ছাড়া এ কোন গর্হিত কাজও নয়।

জিতেনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—তুমি চুপ করো! আমি জানি কে তাকে এই অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে।

খ্যাঁদা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কে?

—তুমি।

খ্যাঁদার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাথা ঘুরিতে লাগিল। হায় ভগবান তুমিও কি এমন অপমান সহ্য করিবে?

জিতেনবাবু কঠোর কণ্ঠে কহিলেন,--আমার ইচ্ছা তুমি যতদূর সম্ভব অপরেশের কাছ থেকে দূরে থাকবে। সকলে মনে করে তোমার সঙ্গদোষই অপরেশের অধঃপতনের কারণ।

মর্ম্মাহত হইয়া খ্যাঁদা বলিল—আমি যথাসম্ভব আপনার আদেশ রাখতে চেষ্টা করব কাকাবাবু। আমার সঙ্গদোষে যাতে অপরা নষ্ট না হয়, আমি তার জন্য যথা সাধ্য করব। শুধু আমার একটি অনুরোধ যদি পারেন মিনতির সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন। খ্যাঁদা প্রস্থানোদ্দত হইল। জিতেনবাবু তাহাকে ডাকিলেন—খ্যাঁদা ফিরিল। জিতেন বাবু বলিলেন, —

—বোস আর একটা কথা বলবার আছে। তিনি কাগজ কলম লইয়া অপরেশের নিকট ছোট্ট একটি পত্র লিখিলেন। উহা খ্যাঁদার হাতে দিয়া তাহা অপরেশকে দিতে বলিলেন। আরও বলিলেন—তাকে বলবে এটা আমার আদেশ। সে যেন আর এই অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করে। আমি পুত্র স্নেহে তার ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করব না এ কথাটি তাকে ভাল করে জানিয়ে দিও।

পঁচিশ

খ্যাঁদা আজ মেসে আসিলে অপরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কিরে হঠাৎ যে আমায় না জানিয়ে বাড়ী চলে গেলি ?

খ্যাঁদা উত্তর দিল—প্রয়োজন ছিল তাই।

—এমন প্রয়োজন যা আমিও জানতে পারি না ?

—অবশ্যই। কিন্তু সে পরে জানবে। তার পূর্ব্বে একটা কথা বলি শোন।

—বল্।

—একটি পাত্রী ঠিক করে এলুম।

—তোর নিজের জন্যে ?

—সে ভাগ্য হলনা।

—কেন ?

—পাত্রীটি স্বয়ম্বরা।

—বা, ব্যাপারটিত বেশ মজারই মনে হচ্ছে।

—নিশ্চয়। কিন্তু পাত্রটি স্বয়ম্বরা হয়েছেন বটে তবে এখন পর্য্যন্ত হিরোকে জানাতে পারেননি।

অপরেশ বলিল,—আর সেই দৌত্যের ভার বুঝি তোর উপরেই পড়েছে ?

—মোটেই নয়। পড়েছিল তারই কোন বান্ধবীর উপর। তিনি সখীর লিপিবার্ত্তা নিয়ে আসছিলেন হিরোটির কাছে কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে পত্রটি যায় হারিয়ে। আর ছিট্‌কে এসে পড়ে এই হতভাগ্য ভবঘুরের হাতে।

অপরেশ হাসিয়া বলিল,—তাই নাকি ? কিন্তু এই হিরো ও হিরোইনই বা কে ? আর তার সখীটিই বা কে ?

—হিরো হচ্ছেন স্বয়ং আমাদের অপরেশ চট্টোপাধ্যায় কবি।

—ধন্যবাদ। কিন্তু হিরোইনটি?

—শ্রীমতি সুচিত্রা দেবী। আর সখীটি রমা দেবী।

—তুই এ আবিষ্কার করলি কোত্থেকে বল্‌তো?

—খ্যাঁদার অসাধ্য কি আছে বল্‌?

—তাহলে তুই ওদের চিনিস?

—আমি চিনি বটে কিন্তু ওরা আমায় চেনেন না।

—কেমন?

—ঐতো খ্যাঁদার রহস্য। তা যাক্‌ তাহলে হিরোইনটি পছন্দ হয়েছে?

সে কথা এখন জানাতে পারিনা। লিপিবার্ত্তাটি দেখতে পারি কি?

—কেন? আর ধৈর্য্য থাকছে না নাকি?

অপরেশ বলিল—বল্‌তে পার। কিন্তু লিপিকাটি পেতে পারি কি?

—এক সর্ত্তে।

—কি?

—আমি যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করব তা রাখতে হবে।

—সম্ভব হলে অবশ্যই রাখব।

খ্যাঁদা পত্রটি বাহির করিয়া অপরেশের হস্তে দিল। অপরেশ পাঠ করিল,—

কবি,—

সেদিন হয়তো ডেকে এনে আপনাকে মিছে বিড়ম্বনা দিয়েছি। হয়তো আমাদের অনধিকার চর্চ্চায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মার্জ্জনা পাবার সাহস করছি। আগামী ৩০শে বৈশাখ আমাদের এখানে একটি জলসার আয়োজন হয়েছে। সাহস পাচ্ছিনা, তবুও ঐ দিন আপনার উপস্থিতি কামনা করতে ইচ্ছে

করছে। আমার সেদিনের অপরাধ যদি অমার্জ্জনীয় হয়, তবে অবশ্যই আপনার উপস্থিতি আশা করিতে পারি। আজ বিকেল চাটের সময় হয়তো আপনাকে আর একবার বিরক্ত করতে যেতে পারি। ইতি—

সুচিত্রা

পত্র পাঠান্তে অপরেশ খ্যাঁদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, খ্যাঁদা বলিল,—এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করলি ?

—আমার সুযোগ্য বন্ধুবর সহকারে আমি তথায় গমন করিব।

—এবিষয়ে আমায় বাদ দিয়ে ভাই।

—কেন ?

—নায়িকা বোধহয় তেমন সন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু সে কথা থাক্। এইবার আমার সর্ত্ত।

—অবশ্যই শুনতে হবে, বল ?

অপরেশ বলিল,—ভাল কথা কিন্তু পাত্রীটি কে' ?

—তোমার এই হিরোইন।

—সুচিত্রা !

কিন্তু বন্ধুবর অতীত দিনের প্রতিজ্ঞাটি স্মরণ কর দেখি ?

—দ্যাখ গান্ধিজীর মত কি জানিস্ ?

—হ্যাঁ।

—অহিংসা নীতিতে দেশকে মুক্ত করা। কিন্তু তিনিও একদিন বললেন, ডু অর ডাই। এক সাহেব পুঙ্গব এই নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, গান্ধিজী অমুক শালে কি বলিয়াছিলেন মনে আছে ? তার উত্তরে গান্ধিজী বললেন, এ শাল আর অমুক সন নয়।

অপরেশ বলিল,—তুইও বুঝি সেই পথ ধরছিস্ ?

—ও সব বাজে কথা যেতে দে। আমি যা বলি শোন্। মেয়েটি সত্যি তোকে ভালবাসে। আর সে যে নারীরত্ন সে

যয়েও সন্দেহ নেই। মেয়েটি তোর সান্নিধ্য চায়—আর তুই আধুনিক যুগের ছেলে হলেও তার মুখের দিকে একবার ফিরে তাকাতে পারিসনে?

অপরেশ বলিল,—সত্যি, সুচিত্রার নাম শুনেছি।

এক কলেজে পড়ি। বাক্যালাপও করেছি। কিন্তু ভুলেও কোনদিন ওর মুখের পানে তাকাই নি। আজ যদি সুচিত্রা সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, তবে মুখ দেখে আমি তাকে চিন্‌তে পারব না। যদি চিনি সে তার কণ্ঠস্বরে। তুইতো জানিস, কেন আমি······

খঁ্যাদা উত্তর দিল,—জানি। কিন্তু এবার থেকে তোকে ঐ সুচিত্রার মুখের দিকেই তাকাতে হবে।

—তাহলে ব্যাভীচারী হতে বলিস?

—ব্যাভীচারী হতে কাউকে আমি কোন দিন বলিনি, বলবও না। শুধু বলি মানুষ হতে।

—মানুষই যদি হতে হয় তবে আমাকে······

—মিনতিকে পেতে হবে এইতো? কিন্তু আমি যদি বলি সেটা তোর অন্যায় দাবী?

অপরেশ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল,—খঁ্যাদা?

খঁ্যাদা অপরেশের হাত দুইটি ধরিয়া বলিল,—অপরেশ সত্যি বল্ আমার দ্বারা তোর কোনদিন কোন প্রকার ক্ষতি হয়েছে? আমি তোকে কোনদিন অধঃপতনের পথে টেনে নিয়েছি? আমি তোর জীবনে বিড়ম্বনা এনেছি? আমি তোকে জেনে শুনে পাপে উৎসাহ দিয়েছি?

অন্তরের অভিমান খঁ্যাদা যেন আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। অপরেশ খঁ্যাদার ব্যবহার বিস্মিত হইল। বলিল,—

—কি হল? তুই যে এমন কচ্ছিস?

খঁ্যাদার সম্বিত ফিরিয়া আসিল। বুঝিল একথা বলিয়া সমূহ ভুল করিয়াছে সে। বলিল—

—না না ও কিছু না, ও কিছু না।

কিন্তু ফাঁকি দিয়া আর অপরেশের মনের সন্দেহের কালিমা ঘুচাইতে পারিল না। অপরেশ খঁ্যাদার হাত ধরিল।

—সত্যি বল্ খঁ্যাদা, তুই বাড়ী গিয়েছিলি কেন ?

খঁ্যাদা বলিল,—আচ্ছা অপরেশ মিনতিকে কি না পেলেই তোর নয় ?

—না।

—কিন্তু তাকে তো পাওয়া যাবে না।

—কেন ?

খঁ্যাদা আণুপূর্বিক সকল ঘটনা অপরেশের নিকট ভাঙ্গিয়া বলিল। অপরেশ শুনিয়া যেন 'থ' হইয়া গেল। খঁ্যাদা বলিল,—

—ওর কথা ভুলে যা অপরা। ও এখন পরস্ত্রী হতে চলছে।

অপরেশ চিৎকার করিয়া বলিল,—

—না,—না-না হতে পারে না।

খঁ্যাদা জিতেনবাবু লিখিত পত্রটি অপরেশের হাতে দিয়া বলিল,—

—আমি এই সংবাদ পেয়েই দেশে গিয়েছিলেম। সকলকে ভেঙ্গেচুরে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আমার কথায় কেউ কান দিল না। শেষে নিরুপায় হয়ে মিনতিকে বললুম। কিন্তু তারও কোন সাড়া পেলাম না।

—হুঁ। বলিয়া অপরেশ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল —বাবা লিখিয়াছেন :

অপরেশ—

তোমার কথা আমার আর জানতে বাকী নেই। খঁ্যাদার কাছে তোমার নির্লজ্জ বাসনার পরিচয় পেয়ে আমি মর্ম্মাহত। এ তুমি অন্যায় করতে যাচ্ছ। আমাদের বংশে চৌদ্দ পুরুষে যা

কখনও হতে পারেনি সেই নিষ্কলঙ্ক বংশের মুখে তোমাকে কলঙ্ক লেপন করিতে দেব না। আমার আদেশ অমান্য করবার চেষ্টা করবে না। অন্যথায় কি হতে পারে তোমার সুযোগ্য বন্ধুর নিকটেই শুনতে পাবে। ইতি—

আঃ তোমার বাবা।

পত্রখানি হস্তে করিয়া অপরেশ উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার মুখাবয়বের বিকৃতি ঘটিতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল।

তাহার এমত অবস্থা দেখিয়া খ্যাঁদার ভয় হইল। সে ডাকিল—অপরেশ।

—কিন্তু আমার জন্যে তুই মিছে কেন অপমানিত হতে গেলি খ্যাঁদা?

খ্যাঁদা বলিল,—না না সে অপমানে আমার কিছুই হয়নি। শুধু তুই ফের অপরা। শুধু তুই ফের।

অপরেশ দাঁতে দাঁত চাপিয়া টেবিলের উপরিস্থিত কাঁচের ফুলদানিটি বজ্র-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল কোন উত্তর দিল না।

পুনরায় খ্যাঁদা ডাকিল—অপরেশ।

—না-না-না। ক্রোধে অপরেশ কাঁচের ফুলদানিটি মেঝের উপর আছড়াইয়া ফেলিল। কাঁচের ফুলদানিটি মেঝের উপর পড়িয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। খ্যাদা ভীত হইয়া ডাকিল—

—অপরেশ।

অপরেশ যেন প্রলাপ বকিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ দেবেই কেন? সবাইতো আর অপরেশ নয়।

দেয়ালে টাঙ্গানো বিরাট দর্পণটিতে তাহার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল সেদিকে তাকাইয়া অপরেশ বলিল,—মূর্খ, তুমি মূর্খ। তোমার ঐ দেহাবরণের মধ্যে—কি আছে জান? আছে একটি

বুদ্ধু। মানে বোকা। fool। তাই ছলনায় ভুলেছিলে। ছলনায় ভুলেছিলে মূর্খ—ছলনায় ভুলেছিলে। তুমিই কবি, না? কবি!

টেবিলের উপর হইতে দোয়াতটি লইয়া সে সজোরে বিরাট দর্পণের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। বিরাট দর্পণ ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। অপরেশ পুনরায় বলিল,—কাকাবাবু বলেছিলেন।—মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। ঠিক আছে আজ থেকে আমি কাকাবাবুর—কাকাবাবুর……

খঁ্যাদা ছুটিয়া আসিয়া অপরেশের হাত ধরিল। এক ঝাঁকিতে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অপরেশ বাহিরে চলিয়া গেল। ভাঙ্গা কাচের টুক্‌রোর উপর পড়িয়া খঁ্যাদার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু উহা অগ্রাহ্য করিয়াই সে পুনরায় অপরেশকে ফিরাইতে চলিল।

সুচিত্রা অপরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল—দেখিল অপরেশ ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সম্মুখ হইতে সে তাহাকে বাঁধা দিয়া ডাকিল,—

—অপরেশবাবু?

অপরেশের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই। সুচিত্রাকে লক্ষ্য করিবার তাহার অবসর নাই,—সুচিত্রা তাহার ধাক্কা খাইয়া 'মাগো' বলিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার ওষ্ঠ কাটিয়া রক্ত গড়াইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হইয়া গেল।

খঁ্যাদা ব্যাকুল হইয়া অপরেশের অনুসরণ করিতেছিল—সুচিত্রার এমত অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার নিকট ছুটিয়া গেল। ততক্ষণ অপরেশ দীনেন্দ্রবাবুর রুমের নিকট আসিয়া পেঁৗছিয়াছে। তাহার পশ্চাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দীনেন্দ্রবাবু কোথাও বাহির হইতেছিলেন অপরেশ পশ্চাৎ হইতে ডাকিল,—কাকাবাবু। দীনেন্দ্রবাবু ফিরিয়া তাকাইলেন। তিনি অপরেশের উত্তেজনা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে তিনি অপরেশের

অন্তরের সকল কথাই যেন জানিতে পারিলেন। হস্ত ইসারায় অপরেশকে ডাকিলেন। তাঁহার অঙ্গ চালনায় এক অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল। অপরেশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিল। বাহিরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন।

খ্যাঁদা হতজ্ঞান সুচিত্রাকে কোলে করিয়া অপরেশের রুমে লইয়া আসিল। মেসের ঠাকুরকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি একটি ট্যাক্সি ঠিক করিতে বলিল। ভৃত্যটি তাহার আদেশ পালনে তৎপর হইল। সৌভাগ্যক্রমে মেসের রাঁধুনী সৌদামিনী ঠাকরুণ অপরেশের রুমে আসিয়া পৌঁছিল। মেসের ভৃত্যটি যতশীঘ্র সম্ভব ট্যাক্সি ঠিক করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল। কিন্তু মুস্কিল হইল তাহার বাসার ঠিকানা লইয়া। সুচিত্রার নিকট যে খাতাটি ছিল তাহাতে তাহার বাসার ঠিকানা লেখা ছিল। খ্যাঁদা বুদ্ধি করিয়া উহা খুলিয়া ধরিতেই ঠিকানা বাহির হইয়া পড়িল। খ্যাঁদা সৌদামিনী ঠাকরুণকে সঙ্গে লইয়া সুচিত্রাকে তাহার বাসায় পৌঁছাইয়া দিল।

বাসার সকল সুচিত্রাকে হতজ্ঞান দেখিয়াই হৈ হুল্লোড় করিয়া উঠিল। খ্যাঁদার নিকট সমস্ত জানিতে চাহিলে, সে প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া সাত পাঁচ দ্বারা তাহাদিগকে ভুলাইয়া যতশীঘ্র সম্ভব মেসের দিকে রওনা হইল।

ছাব্বিশ

একটি অন্ধকার গলির ভিতর আসিয়া ট্যাক্সি থামিল। পার্শ্বে একটি স্যাতস্যাতে পুরাণো বাড়ী। দেওয়ালের গায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আব্ছা আব্ছা নম্বরটি যেন চোখেই পড়ে না। তাহারা উভয়ে ট্যাক্সি হইতে অবতরণ করিয়া ড্রাইভারের ভাড়া মিটাইয়া দিল। ট্যাক্সিখানা পুনরায় আরোহী অন্বেষণে বড় রাস্তার অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। দীনেন্দ্রবাবু ভাঙ্গা বাড়ীটির দরজার কড়া নাড়িলেন। একজন রুক্ষকায় লোক আসিয়া দরজা খুলিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। দীনেন্দ্রবাবু তাহার পার্শ্ব কাটাইয়া অপরেশের সহিত সোপান বাহিয়া দ্বিতলে আরোহণ করিলেন। একজন লোক বসিয়া ঝিমাইতেছিল। দীনেন্দ্রবাবু তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন,—

—মধু—

লোকটি চম্‌কাইয়া উঠিল,—কে? ওঃ কর্ত্তা।—আজ্ঞে হ্যাঁ। দীনেন্দ্রবাবু ও অপরেশ উপবেশন করিলেন। অপরেশ বলিল—আমি কেন এসেছি জানেন কাকাবাবু?

দীনেন্দ্রবাবু বললেন,— কিছুটা অনুমান করতে পারি।

অপরেশ বলিল,—আজ আমি জেনেছি কাকাবাবু মানুষ শঠ, রূঢ়, হিংস্র, জোচ্চোর ও লম্পট। পৃথিবীতে মানুষ নেই, আছে মানুষের দেহধারী কতকগুলো শয়তান। মানুষের মুখে মধু, অন্তরে গরল। সব শঠ, সব শয়তান। আমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমায় আপনি দীক্ষা দিন।

দীনেন্দ্রবাবু অপরেশের উত্তেজনা লক্ষ্য করলেন। তিনি যেন এমনি একটি দিনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন সমাজের ক্রুর আঘাতে আজ অপরেশ উন্মাদ প্রায়। উত্তম সুযোগ। তিনি বলিলেন—সত্যি দীক্ষিত হবে?

—হ্যাঁ।

—আমার মনে হয় তুমি যেন সমাজের নিকট হ'তে কোন একটা গুরুতর আঘাত পেয়েছ ?

—হ্যাঁ।

—তুমি বুঝেছ সমাজের কর্ণধার হয়ে সাধুর মুখোস পরে সবার উপর অত্যাচার চালিয়ে যাওয়াই ওদের অভ্যাস।

—হ্যাঁ।

—জীবনে তুমি কখনো এদের ক্ষমা করবে ?

অপরেশ যেন প্রায় চিৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল—কোন দিনও নয়। এদের বুকের রক্ত গ্রহণই আজ থেকে আমার জীবনের ব্রত।

—বেশ তবে এস।

দু'জনের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মধু সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে কর্ত্তা ?

—তোদের কাছে যার কথা বলতুম সেই।

লোকটি "পেন্নাম হই দাদাঠাকুর" বলিয়া অপরেশকে গড় করিল।

দীনেন্দ্রবাবু বলিলেন—আজ আমি মুক্ত হব রে মধু।

—সে কি কর্ত্তা ?

—আমার সকল ভার ওর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমি মুক্তি নেব।

মধু বলিল—মুক্তি নিবার কথা কইলেই হইল। মুক্তি দেয় কেডা। আপনে মুক্তি পাইলে আমরা গরীব লোক যাইমু কোহানে?

—আমার চাইতেও যার কাছে সুখে থাকতে পারবে—তার কাছে রেখে যাব। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাশীতেই কাটাতে চাই।

তারপর তিনি অপরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—এরাই হবে পৃথিবীতে তোমার সকল ইচ্ছা পূরণের প্রধান সহায়; তোমার বন্ধু, তোমার ভৃত্য, তোমার সন্তান।

সাতাশ

মানুষের অন্যের উপর অনেক সময় অধিকার জন্মিয়া থাকে কিন্তু তাহার নিজের উপর অধিকার বিস্তারের কালে অনেক সময় তাহাকে পরাজিত হইতে হয়। এই পৃথিবীতে দুষ্কর কার্য্যসমূহের মধ্যে আত্মসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। সুচিত্রার বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। কলেজের অনেক ছেলেই তাহাকে ভালবাসিতে চাহিয়াছে কত বড় লোকের ছেলে প্রেম করিবার নিমিত্ত অর্থের লোভ দেখাইয়াছে। কত জন কত মিনতি করিয়াছে; কিন্তু সে কাহাকেও ভালবাসে নাই। অথচ যে কোনদিন ভুলেও তাহার ভালবাসা কামনা করে নাই, কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে সেই অপরেশকেই সুচিত্রা জীবন দান করিয়া ফেলিয়াছে। সুচিত্রা জানে অপরেশ তাহাকে ভালবাসে না, হয়তো বাসিবেও না, তবুও তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মন অপরেশের জন্য সকল পণ করিয়া জানে না কিসের বিনিময়ে বিকাইয়া বসিয়া আছে। সেদিনের ব্যবহারেও সে অপরেশকে ঘৃণা করিতে পারে নাই, বরং আরও শতগুণ ভালবাসিয়াছে। প্রেম যদি অবহেলা পায়, তবে সে আরও দ্বিগুণ ভাবে ভালবাসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

শূন্য মনে সুচিত্রা জানালার ধারে বসিয়া অপরেশের লিখিত একখানি গান গাহিতেছিল। গানের শেষে সুচিত্রার আঁখিদ্বয় সিক্ত হইয়া উঠিল। জানালার শিক ধরিয়া সে বাহিরের অনন্ত আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। কলেজবান্ধবী রমা সুচিত্রার রুমে আসিয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু উদাসিনী সুচিত্রা তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। রমা পশ্চাৎদিক হইতে সুচিত্রার স্কন্ধে হাত রাখিতে সে চমকিয়া উঠিল। রমা বলিল—

…কিরে আজ কয়দিন যে বড় কলেজ যাচ্ছিস্ না?

—শরীরটা ভাল ছিলনা তাই।

—হ্যাঁ শুনলুম আজ কয়দিন নাকি তুই অসুস্থ। সবিতা বললে তুই নাকি কোথায় হঠাৎ ফিট হয়ে পড়েছিলি?

সুচিত্রা মিথ্যা কহিল—হ্যাঁ। একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তাই রাস্তায় চলতে মাথাটা একটু ঘুরে গেল সেদিন। আজ পর্য্যন্তও নিজেকে সুস্থবোধ করছি না।

রমা বলিল—কিন্তু কলেজে তোদের নিয়ে কত রটনাই না রটতে আরম্ভ হয়েছে।

সুচিত্রা প্রশ্ন করিল—আমাদের মানে।

—তুই আর অপরেশবাবু। অপরেশবাবুও যে আজ কদিন কলেজে যাচ্ছেন না। তুই তাঁর কোন খবর রাখিস্?

অপরেশের নাম শ্রবণ করিতেই সুচিত্রার বুকের ভিতর মোচড় খাইয়া উঠিল। বুকের ভাব মুখে গোপন করিতে গিয়াও সে সম্পূর্ণ লুকাইতে পারিল না। রমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্তই ধরা পড়িল। সুচিত্রা বলিল—আমিতো তাঁর কোন সংবাদ জানিনা।

রমা বলিল—কিন্তু তাঁর এমন absent হ'বার মানে কি? প্রফেসর রোজ ওর কথা বলেন। যাক্ সে কথা। আজ কেমন বোধ কচ্ছিস?

—কোন রকম।

—তা'হলে কাল ক্লাশ attend করতে পারবি?

—না ভাই—!

—কেন, এইতো আর সপ্তাহ খানেক পর পূজার বন্ধ আরম্ভ হবে।

—আর যদি যাই, একেবারে পূজোর ছুটির পর যাব। এর আগে যাওয়া আর সম্ভব হবে না।

রমা এক দৃষ্টে সুচিত্রাকে লক্ষ্য করিতেছিল, বলিল—দেখ, সুচিত্রা আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না।

—মানে?

—কোথায় কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। যা রটে তার কিছু বটে। তোর এই দেহের দুর্বলতার চেয়ে মনের দুর্বলতাই বেশী মনে হচ্ছে।

সুচিত্রা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—যাঃ।

রমা বলিল—যাই বলিস কিছুই চাপতে পারিসনি। তোর মুখ চোখই সব বলে দিচ্ছে। তাহ'লে ধরা দিয়েছিস? তোর সম্বন্ধে আমার কিন্তু হাই আইডিয়া ছিল। তুইও শেষে······।

—যা তো বড্ড বাজে বক্‌ছিস্।

—যেতে বলছিস্—যাচ্ছি। কিন্তু······

রমা প্রস্থানোদ্যতা হইল। সুচিত্রা ডাকিল—

—বা রে চা না খেয়েই যাবি? বোস্।

রমা রহস্য করিয়া বলিল—এখন কি আমাদের চা খাওয়ানোর কথা মনে থাকে?

—কেন থাকবে না?

—না ভাই যে ফাঁদে পড়েছ ও ফাঁদে পড়লে বাইরের কথা বড় একটা মনে থাকে না কিনা।

—সে তোরাই ভাল জানিস্।

—তুইও জানবি।

সুচিত্রা চায়ের আয়োজন করিতে লাগিল। রমা বলিল—তাহলে সত্যিই এর মধ্যে আর কলেজে যাচ্ছিস্ না?

—না। হয়তো দু'এক দিনের মধ্যেই মধুপুর যাচ্ছি।

রমা জিজ্ঞাসা করল—মধুপুর মানে?

কেন, মধুপুরে আমাদের বাড়ী।

—ওঃ আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

সুচিত্রা চা প্রস্তুত করিয়া রমাকে দিল ও নিজে লইল। রমা বলিল—

—বুঝলি সুচিত্রা, বেঙ্গলী প্রফেসর অপরেশবাবু সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু লক্ষ্য করেছিস সমরেশবাবু ওঁর নাম শুনলেই কেমন হয়ে যান। ওর ধারণা অপরেশবাবুর কবিতা সম্বন্ধে প্রফেসর যা বলেন তা মোটেই সত্য নয়। ওটা নাকি প্রফেসরের অপরেশবাবুর পক্ষে একটা পার্শিয়ালটি।

সুচিত্রা উত্তর দিল—যার যেমন ইচ্ছে তেমন ভাবুন ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? আচ্ছা তুই যে অপরেশ-বাবুর 'মিনতি' বলে কবিতার খাতাটি নিয়েছিলি, ফিরিয়ে দিয়েছিস?

—না তো। কেন?

—তবে ভাই 'প্লিজ' ওটা আমাকে একটু দিবি?

—আচ্ছা কাল নিয়ে আসব। কিন্তু ভাবছি অপরেশবাবুর কথা; কি হল?

কিন্তু কথা শেষ করিবার পূর্বেই হঠাৎ সে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল:

—না ভাই এখন উঠতে হয়। পাঁচটায় আবার সুধীরবাবুর আসবার কথা আছে।

সুচিত্রা বলিল—আচ্ছা আয় তবে।

রমা বাহিরে আসিল। সুচিত্রা দোর পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিল। সুচিত্রা চলিতে চলিতে হঠাৎ একবার তাহাকে ডাকিল—শুনছিস্?

রমা ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল—আমায় ডাকলি?

—অপরেশবাবুর খবর পেলে জানাস্।

—এতই ব্যস্ত?

যাঃ জানাস কিন্তু।

—অবশ্যই। তবে আসি।

রমা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। সুচিত্রা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় আপনার নির্জ্জন কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

আটাশ

অপরাহ্নে অপরেশের খোঁজে খ্যাঁদা মেসে আসিয়া সৌদামিনি ঠাকরুণের নিকট খোঁজ করিয়া জানিতে পারিল; দ্বিপ্রহরের আহারান্তে অপরেশ কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। দীনেন্দ্রবাবু খোঁজ লইয়া জানিতে পারিল তিনি কয়দিন হইল কাশী চলিয়া গিয়াছেন। খ্যাঁদার কেমন সন্দেহ হইল। কারণ উদ্‌ভ্রান্তের মত অপরেশ যখন কাকাবাবুর ঘরে ছুটিয়া গেল তখনই খ্যাঁদা তাহার মাঝে অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করিয়াছে। ধীরে ধীরে অপরেশের কক্ষের নিকট আসিয়া সে দেখিতে পাইল, দরজা খোলাই রহিয়াছে। অপরেশ ঘরে নাই। ভাবিল বাহিরে কোথাও গিয়াছে এখনই ফিরিতে পারে। খ্যাঁদা অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রমা কলেজ ফেরার পথে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, ভাবিল একবার অপরেশবাবুর সংবাদটি লইয়া যাই। সেও বরাবর অপরেশের 'রুমের' দিকে চলিয়া আসিল এবং দরজা খোলা দেখিয়া বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করিল। কিন্তু খ্যাঁদাকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল। খ্যাঁদা তাহার সঙ্কোচ দূর করিয়া বলিল—

—আসুন, আসুন, বসুন।

রমা বলিল—অপরেশবাবু কোথায়?

খ্যাঁদা বলিল—কোথাও হয়তো বেরিয়েছে, আসবেখন বসুন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

—না আর বসব না। এসেছিলাম একটু ওর খোঁজ নিতে। আজ কয়দিন কলেজে যাচ্ছে না কিনা।

খ্যাঁদা আশ্চর্য হইয়া বলিল—ওকি একয়দিন কলেজে যায়নি নাকি?

—না ত।

—সেত ভাল কথা নয়।

—মানে?

—আছে। আচ্ছা আপনি বসুন না।

—দেরী হয়ে যাবে যে!

খ্যাঁদা বলিল—কিন্তু আপনাকে যে কয়টি কথা বলবার ছিল।

রমা বলিল—আমাকে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বলুন?

—বসুন না। একটু ধীরে-সুস্থে বলতে চাই কিনা।

রমা জিজ্ঞাসা করিল—আপনি?

আজ্ঞে অপরেশের বন্ধুও বলতে পারেন। অভিবাবকও বলতে পারেন। তবে কলকাতায় আমি অভিবাবকই।

রমা খ্যাঁদাকে তাড়াতাড়ি নমস্কার করিল। খ্যাঁদা বলিল—হঠাৎ এতক্ষণ পরে নমস্কার?

—মানে, এই মানে……।

—মানে আমি অপরেশের গার্জ্জেন এইতো? কিন্তু আমাকে বন্ধু হিসেবেই ধরে নিতে পারেন। আচ্ছা একটা কথা বলব?

—বলুন?

খ্যাঁদা হাত কচলাইয়া বলিল—মনে করুন, মানে এই গিয়ে ……ধরুন……মানে…। মাপ করবেন বলতেও ভরসা হচ্ছে না অথচ না বললেও নয়।

রমা অভয় দিয়া বলিল—নিঃসঙ্কোচে বলুন?

—তাহলে অভয় দিচ্ছেন? আচ্ছা বলি। দেখুন—মানে; কলেজের ব্যাপার নিয়ে। এই মনে করুন (এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া) বোঝেনইতো, co-education মানেই হচ্ছে প্রেমাডুকেশন। রমা যেন সম্মানে আঘাত পাইয়া বলিল—

—আপনি কি বলছেন? What do you mean?

খ্যাঁদা মাথা চুলকাইয়া বলিল—হেঃ হেঃ রাগ করবেন না, রাগ করবেন না। আগে সবটা শুননই না।

রমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—অর্থাৎ আপনি বলছেন—আপনাকে একটি মেয়ে ধরে দিতে পারি কিনা এইতো, প্রেম করবার বুঝি খুব সখ হয়েছে?

খ্যাঁদা জিহ্বা দংশনপূর্ব্বক কহিল—রাম, রাম, কি যে বলেন আপনি। তা নয়। তা নয়। বলছিলুম কিনা এই অপরেশটাকে যদি কেউ প্রেমে ফেল্‌তে পারতো......।

রমা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—আপনি কি মনে করেন আপনার অপরেশ এখনও কচি খোকাই রয়েছে? প্রেম বল্‌তে সে কিছুই বোঝে না। প্রেমের বানে সে আজকাল হাবুডুবু খাচ্ছে।—

তাই নাকি, তাই নাকি? ওঃ বাঁচিয়েছেন! খ্যাঁদা কোচার খুট খুঁলিয়া বাতাস দিতে লাগিল।

—অপরেশের প্রেম সম্বন্ধে আপনার যে এত কিউরিসিটি?

খ্যাঁদা বলিল—সে আর এক মজার ব্যাপার। সেও আর এক প্রেমের কাহিনী। বলছি শুনুন—সে কিছু বলিতে যাইবে হঠাৎ এমন সময় তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল অপরেশের খোলা বইটির উপর। একখানা চিঠির মত কি দেখা যাইতেছে। খ্যাঁদা তাড়াতাড়ি চিঠিখানি টানিয়া আনিয়া খুলিল। একি! এযে তাহারই নিকট লিখিত। খ্যাঁদা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিল। অপরেশ লিখিয়াছে—

বন্ধু,—

জানি যখনই তুমি আমার পলায়নের কাহিনী শুনতে পাবে, এই হতভাগ্য কবির জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করে খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু ভাই আমার শেষ অনুরোধ—মনে কোরো অপরেশ মরে গেছে। তাকে ভুলে যেও। বৃথা তার খোঁজ কোরোনা বন্ধু।

ইতি তোমার

হতভাগ্য কবি

খ্যাঁদা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। উত্তেজনায় বলিয়া উঠিল —না, না এ হতে পারে না। আমি এ হতে দেব না। আমাকে ঠাকুর্দ্দার আদেশ পালন করতেই হবে। করতেই হবে।

তাহার মুখে চোখে এক অদ্ভুত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটিয়া উঠিল।

রমা বিস্মিত হইয়া বলিল—ওকি! আপনি অমন কচ্ছেন কেন?

খ্যাঁদা রমার নিকট অপরেশের পত্রখানি বাড়াইয়া ধরিল। রমা পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিল—

—তাইতো, ভারিতো অদ্ভুত।

খ্যাঁদা বলিল—কিন্তু আমি কিছুতেই তাকে যেতে দেব না। আমি জানি সে কোথায়।

—কোথায়?

—কাশী।

—কাশী!

খ্যাঁদা বলিল—হ্যাঁ কাশী। সব দীনেন্দ্রবাবুর কাজ। আমি আজই কাশী রওনা হব।

উনত্রিশ

আজ পত্রিকার সেরা খবর মধুপুরের ডাকাতির কথা। সারা শহরের লোক এই অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

মধুপুর ১৩ই ফাল্গুন।

গতরাত্রে মধুপুর গ্রামে এক রহস্যময় ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতদল সারা গ্রাম জুড়িয়া আক্রমণ করে। তাহারা আধুনিক সমরোপযোগি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ডাকাত দল প্রত্যেকটি গৃহেই হানা দেয়। গ্রামের লোকজন বৃথাই বাঁধা দিবার চেষ্টা করে। তাহারা দাঁড়াইতে পারে না। দুর্বৃত্তেরা ধনদৌলতের দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই। কোন প্রাণীর উপর অযথা আঘাত হানে নাই। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীতে যে সমস্ত কুমারী যুবতী দেখিতে পাইয়াছে নিষ্ঠুর ভাবে তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে। ভোর বেলা গ্রামের লোক খবর লইয়া জানিতে পারে, গতকল্য রাত্রিতে দ্বাদশটী সুন্দরী কুমারী যুবতী নিহত হইয়াছে। জন-সাধারণ আগ্রহভরে এই রহস্যময় খুনের তদন্তাপেক্ষা করিতেছে! পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে।

..................................'সন্দেশ'

খ্যাঁদা কাশী আসিয়া দীনেন্দ্রবাবুকে বাহির করিতে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সমস্ত কাশী ঘুরিয়াও দীনেন্দ্রবাবুর কোন সন্ধান পায় নাই। ভোর বেলা বসিয়া ভাবিতেছিল এখন কোথায় যাইবে, দীনেন্দ্রবাবুকে নিতান্ত প্রয়োজন। খ্যাঁদার একান্ত ধারণা একমাত্র দীনেন্দ্রবাবুই অপরেশের সন্ধান দিতে পারেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া খ্যাঁদা দিল্লী যাইবে মনস্থির করিল। ষ্টেশনে আসিয়া দিল্লীর টিকিট ক্রয় করিল। যথা সময়ে দিল্লী-

গামী মেল আসিলে খ্যাঁদা তাহাতে চাপিয়া বসিল। বহুক্ষণ ট্রেনে চলিতে হইবে ভাবিয়া সময় অতিবাহিত করিবার মানসে খ্যাঁদা একখানা নিউজ পেপার কিনিয়া লইল।

ট্রেন ঝক্ ঝক্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। খ্যাঁদা পত্রিকার পাতায় দৃষ্টিপাত করিতেছে। হঠাৎ বাংলা খবরে সে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা দেখিতে পাইল। মধুপুরের সেই রহস্যময় ডাকাতি। কেবল কুমারী যুবতী হত্যা। বাঃ কেসটিতো ভারি ইন্টরেষ্টিং। খ্যাঁদা দুই তিনবার ভাল করিয়া সংবাদটি পাঠ করিল। ধনদৌলতের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কুমারীদের উপর কোন প্রকার অসম্মান বা বলাৎকারের উল্লেখ নাই। কেবল নিষ্ঠুর হত্যা। কিন্তু এর মানে কি? খ্যাঁদা মনে মনে ভাবিল নিশ্চয়ই এতে কোন গুপ্ত রহস্য আছে। এই রহস্য উদঘাটনের আগ্রহ খ্যাঁদাকে পাইয়া বসিল। সে এই রহস্য সম্বন্ধে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল এ কোন ব্যর্থ প্রেমিকের কার্য্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপরেশের কথা মনে হইল। হ্যাঁ সে একদিন বলিয়াছিল যদি মিনতিকে না পাই তবে আমার এই হাত একদিন আত্মীয়দের রক্তে রাঙাব, নিশ্চয়ই রাঙাব।" হয়তো ইহা অপরেশেরও কাণ্ড হইতে পারে। কিন্তু সে এমন দলবল পাইবে কোথায়? হঠাৎ দীনেন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়িয়া গেল। লোকটি চিরকালই কেমন দুর্ব্বোধ্য ছিল। খ্যাঁদা ভাবিল হয়তো এই স্থানেই অপরেশের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। তাহার সকল চিন্তা ওলট পালট হইয়া গেল। পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে মেল থামিতেই খ্যাঁদা নামিয়া পড়িল। ষ্টেশনে অন্য একটি মেল অপেক্ষা করিতেছিল। মেলটি বরাবর বাংলার দিকে চলিবে। খ্যাঁদা আর কাল বিলম্ব না করিয়া একখানা হাওড়ার টিকেট কাটিয়া মেলে চাপিয়া বসিল। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ছোট খাটো খানা ডোবা আর পাহাড় পর্ব্বত পশ্চাতে ফেলিয়া ট্রেন ঝড়ের বেগে বাংলার পথে ছুটিয়া চলিল।

কলিকাতা আসিয়া সর্ব্ব প্রথমই খঁ্যাদা ইনস্‌পেক্টর অতুল গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিল। মিঃ গুপ্ত বৈকাল বেলা আপন কক্ষে বসিয়া কেসটি সম্বন্ধে ভাবিতেছিলেন। খঁ্যাদা দারোয়ান মারফৎ মিঃ গুপ্তের নিকট একখানি কার্ড পাঠাইয়া দিল। মিঃ গুপ্ত শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া একমনে ভাবিতেছিলেন। দারোয়ান আসিয়া সেলাম করিয়া দাড়াইল।

—হুজুর কার্ড হ্যায়।

—দেখি ?

দারোয়ান কার্ডখানা মিঃ গুপ্তের হাতে দিল। নাম লেখা ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী। মিঃ গুপ্ত চিনিতে পারিলেন না। তিনি দারোয়ানকে আগন্তুকটিকে ভিতরে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। দারোয়ান গিয়া তাহাকে খবর দিলে খঁ্যাদা মিঃ গুপ্তের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। মিঃ গুপ্ত তাহাকে প্রতি নমস্কার জানাইয়া বলিলেন।—বসুন।

খঁ্যাদা পার্শ্ববর্ত্তী একটি চেয়ারে উপবেশন করিল। মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করিলেন—কি চাই ?

—দেখুন আমি এসেছি মধুপুরের সেই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে।

মিঃ গুপ্ত খঁ্যাদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন—মনে হচ্ছে ঐ ব্যাপারটা নিয়ে আপনি খুব বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন ?

হ্যাঁ তা একটু ঘামাচ্ছি বৈকি !

আপনার কি কোন আত্মীয় এই মার্ডার কেসে···

আজ্ঞে না, আমার কোন আত্মীয়স্বজন এতে মারা যায়নি।

—তবে আপনার এই ঔৎসুক্যের মানে ?

—মানে এই রহস্যের যাতে কিনারা হয় তাই।

—তাতে আপনার লাভ ?

লাভ ? আপনি বলেন কি ? এমন একটা অন্যায় কাজের

কিনারা হলে আমার লাভ নেই? যেখানে জনসাধারণের স্বার্থ সেখানেই তো আমার লাভ।

মিঃ গুপ্ত বলিলেন—যাক সে কথা। আপনি কি বলতে চান?

—আপনারা কেসটি সম্বন্ধে ভাবছেন?

—ভাবছি বৈকি।

—কিন্তু এর কোন হেতু বের করতে পেরেছেন?

হেতুই যদি পাব তবে আর ভাববো কেন?

খ্যাঁদা বলিল—আমার মনে হয় আমি এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছি।

—আপনি! ইনস্‌পেক্টর গুপ্ত আগ্রহভরে খ্যাঁদার দিকে তাকাইল।

খ্যাঁদা বলিল—

—আপনারা একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছেন?

কি?

হত্যাকারীর ক্রোধটা কেবল নারীদের দিকে—বিশেষতঃ কুমারীদের প্রতি?

মিঃ গুপ্ত বলিলেন—নিশ্চয়। আর সেইটেই তো বড় রহস্য।

—কিন্তু আমি অতি সহজেই সেই রহস্যটি ভেদ করেছি।

—আপনি!

খ্যাঁদা বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার মনে হয় এই ক্রাইমটি হচ্ছে কোন ডেসপায়ার্ড লভার দ্বারা। হতাশ প্রেমিক দ্বারা।

—তার সঙ্গে এর কি সংশ্রব থাকতে পারে?

—অনেক কিছুই থাকতে পারে। নারীর জন্য পৃথিবীতে এ প্রকার হত্যার উদাহরণ বহু আছে। তবু এটা একটু স্বতন্ত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নারীর প্রেমে পড়ে হয়তো পুরুষে পুরুষে-সংঘর্ষ হয়েছে এবং তাতে মরেছেও অনেক পুরুষই। এ প্রকার

নারী হত্যার উদাহরণ বড় একটা দেখা যায়নি। নারীর উপর একটা ঘৃণা জন্মে গেছে এবং তাই থেকে···

ইন্‌সপেক্টর অতুল গুপ্তের নিকট পয়েণ্ট কয়েকটি যেন খুব মূল্যবান বলিয়া মনে হইল। তিনি কথা কয়টি টুকিয়া রাখিলেন। তিনি খ্যাঁদাকে বলিলেন—

—আচ্ছা আপনি কি এই কেস্‌টাতে আমাদের একটু সাহায্য করতে পারেন?

নিশ্চয় এবং আমি নিজেই কেস্‌টির তদন্ত করতে চাই।

মিঃ গুপ্ত বলিলেন—বেশ, আমরা আমাদের যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। বলুন কি সাহায্য আপনার চাই? লোকজন, পুলিশ, টাকা পয়সা বা অস্ত্র······

খ্যাঁদা বলিল—লোকজন বা পুলিশের আমার প্রয়োজনই নেই। আত্মরক্ষার্থে শুধু একটি অস্ত্র হলে আমার যথেষ্ট হবে।

—বেশ আমি আপনাকে পারমিশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—ধন্যবাদ।

—আশা করি সফল মনোরথ হয়ে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করবেন।

সে আমারা যথাসাধ্য করব। আচ্ছা তাহলে আজ আমি উঠি, নমস্কার।

—নমস্কার।

খ্যাঁদা আবার পথে বাহির হইল। তাহার মস্তিষ্কে এই নূতন কেস্‌টি অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ত্রিশ

প্রাতঃকালে চা পান করিতে করিতে ক্ষেত্রনাথবাবু বলিলেন—ঈশ্বর মঙ্গলময়! কি বলিস মা সুচিত্রা।

সুচিত্রা প্রশ্ন করিল—এ কথা বলছ যে?

—ভাগ্যিস তখন আমাদের মধুপুর যাওয়া বন্ধ হয়েছিল। সেখানে থাকলে না জানি আজ কি ভাগ্যে ছিল।

—ও! তুমি ডাকাতির কথা বলছ বাবা?

—হ্যাঁ। কি ভয়ানক কথা বল দেখি মা? না না তোকে নিয়ে আর কখনো গ্রামে যাওয়া যাবে না। কি জানি কখন কি হয় বলা যায় না। কি সর্ব্বনেশেরে বাবা। খুন তাও কিনা দ্বাদশটি তরুণী নারী—একই রাত্রে। অথচ ধন দৌলত, টাকা পয়সা বা পুরুষদের জীবন পর্য্যন্ত একটুও বিপন্ন হয় নাই। বিশ্বের ইতিহাসে এরকম ঘটনাতো কখনও শুনিনি। শুনে একেবারে 'থ' লেগে যায়। ভেবেছিলাম বন্ধটা বাড়ী গিয়েই কাটাব, কিন্তু এসব দেখে শুনে আর যেতে সাহস হচ্ছে না।

সুচিত্রা একটু হাসিয়া বলিল—ডাকাতদের ভয়ে দেখছি তোমায় গ্রাম ছাড়তে হবে?

—কিন্তু কি আর করি বল?

সুচিত্রা বলিল—অন্যায় দেখে যদি সবাই এমনি দূরে দূরে সরে থাকতে চায় তবে অন্যায়কে শাস্তি দেবে কে? অন্যায়ের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যদি কলিকাতায় এসে সবাই নিরাপদে বাস করতে চাও, তবে গ্রামের উপর অত্যাচার সে ত দিন দিন বেড়েই চল্‌বে। ডাকাতির ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে থাকা মানে ডাকাতকে প্রশ্রয় দেওয়া। কবি বলেছেন—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।

ডাকাতরা ততদূর দোষী হবে না, যতদূর দোষী হবে তোমরা, যদি তাদের এমন করে প্রশ্রয় দাও। ভাব দেখি, গ্রাম-বাসীর কথা। তারা কি সকল বিপদ মাথায় করেও গ্রামে বাস করছে না? যদি তারা পারে তুমি পারবে না কেন? তাদের যে গতি তোমারও সেই গতি হওয়া উচিত। তোমার মেয়ের মর্য্যাদা আছে। তাদের মেয়ের নেই? তুমি একলা স্বার্থপরের মত তোমার মেয়ের সম্মান বাঁচাবে, কিন্তু সে বাঁচানোর কোন মূল্য নেই।

—তবে কি করব?

সুচিত্রা সুস্পষ্টভাবে উত্তর দিতে যাইবে হঠাৎ সুচিত্রার সহ-পাঠিনী রমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তে এই মাত্র কেনা টাটকা খবর বোঝাই নূতন খবরের কাগজটি। ঘরে ঢুকিয়াই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রমা বলিল—দেখেছিস্, দেখেছিস্ সুচিত্রা।

সে পত্রিকার পৃষ্ঠাটি সুচিত্রার চক্ষুর সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। সুচিত্রা পাঠ করিল—

গতকল্য রাত্রিতে মধুপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হরনাথপুরে মধুপুরের অনুরূপ এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এক রাত্রিতে বিশটি যুবতি নারী নৃশংস ভাবে নিহত হইয়াছে। পর পর এমন দুইটি ভয়াবহ ঘটনার অনুষ্ঠানে গ্রামাঞ্চলস্থ লোক সকল ভীত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ নিজ নিজ কন্যাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রাম ত্যাগ করিতে তৎপর হইয়াছেন। নিত্য নিত্য এমত ঘটনা-ঘটিতে থাকিলে গ্রামবাসিদের গ্রামে বাস করা দুঃসহ হইয়া উঠিবে। পুলিশ এ বিষয়ে জোর তদন্ত চালাইতেছে। আমরা অনতিবিলম্বে এই রহস্যময় খুনের বিষয় জানিতে চাহিতেছি।

'সন্দেশ'

ক্ষেত্রনাথবাবু সংবাদ শ্রবনান্তে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। খানিকক্ষণ নীরবে থাকিবার পর তিনি সুচিত্রাকে

বলিলেন—দেখলিতো! এরপরও বাড়ী যেতে চাস্? আর এ জেনেও আমায় বাড়ী যেতে বলছিস্?

সুচিত্রা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল—কেন বলব না। তুমি গ্রামের জমীদার। গ্রামের রক্ষা কর্ত্তা। অসহায় প্রজাদের এই দুর্দ্দিনে তুমি নিশ্চিন্ত মনে কলিকাতা কাটাতে পার না। ডাকাত দলের বিরুদ্ধে লড়বার মত একখানা হাতিয়ারও গ্রামের লোকদের নেই! অথচ তুমি জমিদার তোমার ঘরে কয়েকটা বন্ধুক পড়ে রয়েছে। আজ তুমি যদি ঐ অস্ত্রগুলো নিয়ে নিঃসহায় প্রজাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও, ভাব দেখি কত শক্তি পায় তারা তাদের বুকে?

ক্ষেত্রনাথবাবু নৈরাশ্যব্যঞ্জক কণ্ঠে কহিলেন—আমার বন্দুকের কথা বলছিস? আমার ঐ দু-চারটে বন্দুক দিয়ে কি হবে? দেখেছিস না লেখা রয়েছে ডাকাতদল সম্পূর্ণ সময়োপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত!

সুচিত্রা বলিল—কিন্তু যেখানে একটি অস্ত্রও নেই সেখানে ঐ কয়টি বন্দুকই কি গ্রামবাসিদের যথেষ্ট উপকারে আসতে পারে না? একদিন অস্ত্রেরই সাহায্যে তোমার কুখ্যাত পূর্ব পুরুষগণ নারীর উপর করেছে অকথ্য অত্যাচার, চালিয়েছে পাশবিক বর্ব্বরতা, নারীর সতীত্ব করেছে হরণ। সে ইতিহাস তোমার জানতে বাকী নেই। আজ এসেছে যোগ্য মুহূর্ত্ত। তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার। যে অস্ত্র একদিন তোমাদেরই প্রজাদের বুকের রক্ত শোষণ করেছে, সেই অস্ত্র নিয়েই আজ তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও তাদের রক্ষা করতে। এসময় তোমার কোন প্রকারেই গ্রাম থেকে সরে গেলে চলবে না বাবা।

ক্ষেত্রনাথবাবু বলিলেন—তাহলে তুই গ্রামে যাবিই?

—অবশ্যই। তুমি যদি না যাও, তবুও।

—তুই গেলে অবশ্য আমাকেও যেতে হবে। তবে···কি বলিতে যাইতেছিলেন। হঠাৎ ভৃত্য রামচরণ আসিয়া ক্ষেত্রবাবুকে জানাইল

যে কে এক ভদ্রলোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ক্ষেত্রনাথ তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেলেন। রমা ও সুচিত্রা কক্ষে রহিল। সুচিত্রা রমাকে বলিল—চা আনব? সুচিত্রা দুলালীকে রমার জন্য এককাপ চা ও বিস্কুট আনিয়া দিতে বলিল। অনতিবিলম্বে দুলালী চায়ের কাপ ও বিস্কুটের পাত্র আনিয়া রমার সম্মুখে রাখিল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রমা কহিল—কিরে, অপরেশবাবুর কথা যে বড় শুধালিনে?

আরক্তিম বদনে সুচিত্রা বলিল—তিনি কেমন আছেন? কলেজ যাচ্ছেন তো?

—আর কলেজ!

—মানে?

—তিনি যে উধাও। রমা সেদিনের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক সকলই সুচিত্রার নিকট বলিল। কথাটা শুনিয়া সুচিত্রা যেন প্রথম কেমন হইয়া গেল। তাহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! অনেকক্ষণ সে কথাই বলিতে পারিল না। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে ধীরে ধীরে কহিল—কিন্তু এরকম করবার মানে?

রমা কহিল—অদ্ভুত। বন্ধুর কাছে শেষ চিঠি দিয়ে গেছেন। সুচিত্রা বিস্মিত হইয়া বলিল—বন্ধু। কে বন্ধু?

—আছে। সে এক ভারি মজার লোক। অপরেশবাবুর সমবয়সী হবে। ছেলেটি বলে কিনা—আমাকে—অপরেশের বন্ধুও ভাবতে পারেন, অভিভাবকও ভাবতে পারেন।

সুচিত্রা বলিল—সে কথা থাক্। কিন্তু তিনি কি লিখেছেন পড়েছিস?

—অবশ্য। লিখেছেন—

বন্ধু—

বৃথা আমার খোঁজ কোর না। আমি জানি আমার পলায়নের কাহিনী শুনিবামাত্রই তুমি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত

পর্য্যন্ত আমার খোঁজে ছুটে বেড়াবে। আমার অনুরোধ, মনে করো আমি মরে গেছি। আমাকে ভুলে যাও।

ইতি—তোমার হতভাগ্য কবি।

সুচিত্রা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার জীবনের একটি অচ্ছেদ্য অংশ যেন এই মুহূর্ত্তে খসিয়া গেল। বার বার সেই গ্রাম্য প্রীতিতে ভরা অনিন্দ কিশোর সরল ঢল ঢল মুখখানি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সুচিত্রা তাহাকে বড় ভালবাসিয়াছিল।

একত্রিশ

ক্ষেত্রনাথবাবুকে সুচিত্রার খেয়ালে বাধ্য হইয়া দেশে আসিতে হইয়াছে। আসা অবধি তিনি ভীষণ উৎকণ্ঠায় দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। ডাকাতের ভয়ে রাত্রে তাঁহার সুনিদ্রা পর্য্যন্ত হইতেছে না। অদ্য গ্রামে Arm police আসিয়া পৌঁছাইবে। ক্ষেত্রনাথবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া সুচিত্রাকে কহিলেন :

—যাক উৎপাৎটা তাহলে বোধ হয় থেমেই গেল।

তাই বুঝি তোমাকে এত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয় দেখাবে না! মধুপুরে এসে অবধি এ কয়দিন আমার সুনিদ্রা বলতে কিছু ছিল না। তোকে নিয়ে কি চিন্তা আমার কম? যাক আজ পুলিশগুলো এসে পড়বেখন। একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব। কিন্তু তোকে যেন একটু বিষন্ন দেখাচ্ছে ?

বলা বাহুল্য অপরেশের অন্তর্ধ্যানের পর হইতে সুচিত্রার বেদনার অন্ত ছিল না, কলিকাতাতেই অপরেশের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার স্মৃতিগুলি তাহাকে পাগল করিয়া দিতেছিল। সেইজন্যই সে গ্রামে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষেত্রনাথবাবুর প্রশ্ন শুনিয়া সুচিত্রা উত্তর দিল—কৈ নাতো।

তুই না করলে কি হবে; আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কি হয়েছে তোর ?

—ও কিছু নয়।

ক্ষেত্রনাথবাবু বলিলেন—তুই মা মরা মেয়ে। এতটুকু বেলা থেকে তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। পাছে কোনদিন মনে আঘাত লাগে ভয়ে তুই যা চেয়েছিস তাই দিয়েছি। যা

করেছিস্ তাই সয়েছি। বাধা দিই নি। তোর মুখখানা যদি একটু ভার দেখি সে যে আমার বুকে কত বাজে সে তোকে কি দিয়ে বোঝাব—

এই প্রসঙ্গ সুচিত্রাকে যেন বেদনা দিতেছিল। তাহার ঐ বিষণ্ণ মনের সঙ্গেই যে জড়িত ছিল অপরেশের স্মৃতি। সে কথা অপরে কি করিয়া বুঝিবে। সেই বা এই বিষণ্ণতার হেতু কি করিয়া বুঝাইবে? সুতরাং এই আলোচনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। বলিল—

—আচ্ছা বাবা, ঐ যে দক্ষিণে নদীর ধার দিয়ে দীর্ঘ ঘন সবুজ বনের সারি চলে গেছে, ওটা কাদের? ক্ষেত্রনাথবাবু উত্তর দিলেন—ওটা তোদেরই মা। তোদের পূর্ব্বপুরুষদের হাতে গড়া সাধের মধুপুরের বন। আজ ওটা বন হয়েছে সত্যি, কিন্তু একদিন মাইলের পর মাইল ব্যাপি ঐ দীর্ঘ বনই ছিল যেন সজ্জিত একটি বাগান বাড়ী। আজও ওর ভিতর তোর পূর্ব্বপুরুষদের নির্ম্মিত সুরম্য অট্টালিকারাজী বিদ্যমান। যদিও তাদের অনেকই আজ ভগ্নাবশেষ মাত্র; তবুও সেই ভগ্নাবশেষ দেখেই বুঝতে পারা যায় বাংলার অপূর্ব্ব অনবদ্য স্থাপত্যের নিদর্শন। কিন্তু কুখ্যাত ঐ বন। ঐ বনেই একদিন তোর পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁদের নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন। অসহায় নারীর সতীত্ব হরণ করেছেন। কিন্তু যদিও ও আজ গভীর জঙ্গলে পরিণত তবুও ওর বক্ষ ভেদ করে সবুজ তৃণে ছাওয়া যে পথটি ওপারের গাঁয়ের দিকে চলে গেছে সে পথে হাঁটলে লতাপুষ্পে শোভিতা বনের সৌন্দর্য্যে কার না নয়ন তৃপ্ত হয়। সেকি শোভা মা, থোকা থোকা ফুলের গুচ্ছ। শ্যামচিকণ কচি লতা, অজানা ফুলের সুবাস। সে যেন ধরার বুকে অমরার নন্দন কানন। শাখে শাখে দোল খায় টুনটুনি, ডাকে দোয়েল, উড়ে ভ্রমর, কেমন অবাক দৃষ্টিতে ঢল ঢল চেয়ে থাকে-গোলাপের দল। যেন সে স্বপ্নপুরী।

এমন সুন্দর বনের বর্ণনা শুনিয়া সুচিত্রার লোভ হইল। অধিকন্তু একটি নির্জ্জন স্থানে যাইবার জন্যও তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছে। সে বলিল—আমি ওখানে বেড়াতে যাব বাবা?

—মুচ্‌কুন্দ সিংকে নিয়ে গাড়ী করে বেড়িয়ে এস।

মুচ্‌কুন্দ সিংয়ের প্রয়োজন নেই।

তবে ড্রাইভারকে নিয়েই যাও।

—ড্রাইভারেরও প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই তো মোটর ড্রাইভ করতে পারি।

*　　　*　　　*　　　*

ইনস্‌পেক্টর মিঃ গুপ্তের সাহায্যে খঁ্যাদা একখানি রিভলভার সংগ্রহ কয়িয়া যত শীঘ্র সম্ভব মধুপুরের দিকে রওনা হইয়াছিল। এখানকার বিখ্যাত চিকিৎসক নীহারেন্দু বাবুর গৃহে সে অতিথীরূপে বিরাজ করিতেছিল। খঁ্যাদা নীহারেন্দুবাবুর নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিল। অদ্য দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সে নীহান্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ঐ যে নদীর ধারে বিরাট বনটির মতন পড়ে আছে ওটা কাদের?

নীহারেন্দুবাবু বলিলেন ওটা আমাদের গাঁয়ের জমিদারের।

খঁ্যাদা. প্রশ্ন করিল—ওর থেকে বোধ হয় কাঠ খড়ি বিক্রী করেন?

—না। ওটা অমনি পড়ে থাকে।

—মিছে অতখানি জায়গা বন্ধ করে রাখবার মানে?

—জমিদারের খেয়াল। তবে......? বলিয়াই নীহারেন্দু-বাবু থামিলেন।

খঁ্যাদা প্রশ্ন করিল—কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন মনে হল?

—হ্যাঁ। মানে বনটা সম্বন্ধে একটু রহস্য আছে।

—কি রকম? অবশ্য যদি বলতে বাধা না থাকে।

নীহারেন্দুবাবু. বলিলেন—না,. না বাধার কিছুই নেই। তবে

শুনুন, বনটা ছিল এই গাঁয়ের জমিদারের হাতে গড়া প্রমোদ কুঞ্জ। ঐ বনের ভিতর গেলে এখনও আপনি দেখতে পাবেন সারি সারি ভগ্ন অট্টালিকারাজী পড়ে রয়েছে। ও সব ছিল জমীদারের বিলাসের নাট্যশালা। ঐ বনে গিয়ে অসহায় প্রজাদের উপর তারা অকথ্য অত্যাচার চালাত।

মদগর্ব্বী জমীদারগণ ওখানে যে কত সহস্র সহস্র অসহায়া নারীর সতীত্ব হরণ করেছেন তার ইয়ত্বা নেই। আজ থেকে বিশবৎসর পূর্ব্বে এই বংশের শেষ অত্যাচারী জমীদার এই গাঁয়েরই কোন এক বীর্য্যবান্ পুরুষের হাতে প্রাণ হারাণ ঐ বনে। তারপর থেকে সে লোকটির আর কোন খোঁজ খবর নেই।

খ্যাঁদা বলিল—ব্যাপারটি তো রহস্য জনক। একটু খুলে বললে—

—তবে শুনুন। দীনেন্দ্রবাবু ছিলেন এ গ্রামের একজন······

দীনেন্দ্রবাবুর নাম শ্রবণ করিয়াই খ্যাঁদা চমকিয়া উঠিল—কি বললেন, দীনেন্দ্রবাবু!

হ্যাঁ। তা আপানি অমন করে উঠলেন কেন?

—না ও কিছু নয়। আপনি বলুন।

রহস্যময় দীনেন্দ্রবাবুকে খ্যাঁদা আজ যেন বুঝিতে পারিল। নীহারেন্দুবাবু বলিলেন—দীনেন্দ্রবাবু ছিলেন এ গ্রামেরই একজন উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোক। তাঁর গুনে সমস্ত মধুপুরের লোক তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। আজ থেকে বিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন রাত্রিতে গাঁয়ের হিরালাল এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। তার সুন্দরী স্ত্রীকে অত্যাচারী জমীদার হরনাথ ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। পরহিতৈষী দীনেন্দ্রবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না।

গ্রামের অনুগত লোকদের সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলেন জমীদারের বাগান বাড়ীতে। জমীদারকে রীতিমত অপমান করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন হীরালালের স্ত্রীকে। কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—হ্যাঁ তারপর থেকেই জমীদার সুযোগ খুঁজতে থাকেন এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে। হীরালালের অবাধ গতিবিধি ছিল দীনেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে। জমীদার তাকে—অর্থ দ্বারা বশ করলেন। শ্রীলতা ছিল দীনেন্দ্র বাবুর বোন। এ গাঁয়ের সেরা সুন্দরী। হীরালালের সাহায্যে কৌশলে জমীদার তাহাকে অন্তঃপুর থেকে বের করে আনলেন—দীনেন্দ্রবাবু যখন হীরালালের এই কৃতঘ্নতার কথা জানতে পারলেন ক্রোধে ঘৃণায় তিনি যেন উন্মাদ হয়ে উঠলেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তিনি গ্রামে নেই। এর মাস খানেক পরেই একদিন ভোরবেলা ঐ বনে অত্যচারী জমীদার আর হীরালালের মৃতদেহ পাওয়া গেল।

সমস্ত শ্রবণ করিয়া খ্যাঁদা বলিল—আচ্ছা এই বন সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ আছে ?

—কেমন ?

—এই ডাকাতির বিষয়ে!

নীহারেন্দু বাবু বলিলেন, দেখুন আজ বহুদিন ঐ বন পরিত্যক্ত। লোকজনের ওখানে যাতায়াত নেই। নীচ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে, ওটা নাকি ভূত প্রেতের আড্ডা। একটি ঘটনা বলতে পারি। সেদিন যখন ডাকাতির পর ডাকাত দল চলে যায় তারপরও আমি অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে ছিলুম! বাইরে বসে ভাবছিলুম। নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। হঠাৎ কে যেন তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ঐ বনের দিকে চলে গেল।

খ্যাঁদা বলিল—ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম। মনে কিছু করবেন না। রহস্যময় ঘটনাটি শুনবার কৌতুহল ত্যাগ করতে পারলুম না কিনা।

—না না; সে কি ?

বত্রিশ

আজো সুচিত্রা বেড়াইতে আসিয়াছে। এ বনটাকে সে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে।

শ্যামল বনের মস্তকে অপরাহ্ণের সূর্য্য কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। সূর্য্য কিরণে কচিপত্রগুলি চিক্‌চিক্ করিতেছে ও মৃদু দক্ষিণা হাওয়ায় হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। বনের দিকে তাকাইলে মনে হয় সে যেন অতীত যুগের কত কাহিনীই বলিতে চাহে। তাহার বক্ষ জুড়িয়া কথার মালা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। বদ্ধ বক্ষ পিঞ্জর যন্ত্রণায় মরিতেছে। কহিবার সঙ্গী নাই।

সুচিত্রা গাড়ী ষ্টার্ট দিল। তীব্র বেগে শ্যামল ঘাসের উপর দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। অনতিবিলম্বে সে বনের নিকট আসিয়া পৌঁছাইল। ঐ তো উহার বক্ষ ভেদ করিয়া শ্যামল ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ পথটি চলিয়া গিয়াছে। সুচিত্রা গাড়ীর বেগ কমাইয়া দিল। রাস্তার দুধারে লতাপাতা ঘেরা বনের গায়ে অজস্র নানা রং বেরং এর ফুল ফুটিয়া আছে। বনের বুকে পাখীর মেলা বসিয়াছে। কেহ লতার গায়ে দোল্ খাইতেছে। কেহ আহার অন্বেষণে ব্যস্ত। কোথাও বা দোয়েল মিথুন পরষ্পর সোহাগ করিতেছে। কোন এক বৃক্ষ শাখায় একটানা সুরে পাখী ডাকিতেছে বৌ-কথা কও। ঐ দূরে ভগ্ন অট্টালিকারাজি দেখা যাইতেছে। উহাই একদিন অত্যাচারী জমীদারদের পাপের আশ্রয়স্থল ছিল। হঠাৎ সুচিত্রার ভয় করিয়া উঠে। সেও সেই বংশেরই মেয়ে! এমন যদি হয় দুর্ভাগ্যক্রমে একদল লম্পট আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে? তাহাদের ঘৃণ্য বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে? তাই কি! সেওতো দুর্বল নারী নয়। নিজেকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তার আছে।

বাঃ ঐ যে অদূরে কেমন সুন্দর তৃণে ছাওয়া খানিকটা জায়গা। সুচিত্রা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। শ্যামল ঘাসের ওড়নাটির উপর কে যেন রাশি রাশি ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু হায় এ দৃশ্য বিরহিনীকে আনন্দ দান করিতে পারিল না। এ যেন বারে বারে তাহাকে কবি অপরেশের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। না জানি এই হতভাগ্য সরল যুবকটিকে পৃথিবীতে কত আঘাতই সহ্য করিতে হইয়াছে, যে আঘাতের বেদনা সহ্য না করিতে পারিয়া এমনি করিয়া তাহাকে সমাজ হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। হতভাগ্য সেই কবিকে সুচিত্রা যে কত ভালবাসিয়াছে। সেকি তাহাকে কোন দিনই পাইবে না? তবে হায় ভগবান! সেই সরল মূর্ত্তিটিকে সুচিত্রার নয়ন সম্মুখে কেন ধরিয়াছিলে? কবি অপরেশের লেখা একটি গান তাহার মনে পড়িল। সে যেন সম্পূর্ণ সুচিত্রার মনেরই কথা। সুচিত্রা অভিভূত হইয়া গাহিতে লাগিল। গাহিতে গাহিতে তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। গান শেষ হইল। সুচিত্রার উদ্যত অশ্রু আর বাধা মানিল না। সে একটি বৃক্ষে ঠেস দিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার নিমিত্তই যেন সে বনে আসিয়াছে। তাহার ব্যর্থ জীবন অশ্রু ঝরাতেই ধন্য হোক্।

* * * *

সম্পূর্ণ কাঠুরিয়ার বেশে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বৃদ্ধ বনে পৌঁছিল। বনের বুকে পা দিতেই তাহার কেমন সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে ইতস্তত সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত একটি বিস্তীর্ণ পথ বনের বক্ষভেদ করিয়া কোন অচেনা দেশে চলিয়া গিয়াছে। সে ক্রমশই গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বনটি সৌন্দর্য্য সম্পদে পরিপূর্ণ। বৃদ্ধটি অনেক দূর আসিয়া পড়িল। তখন সূর্য্য ডোবে ডোবে। হঠাৎ বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কিসের যেন শব্দ উত্থিত হইল।

সে পিছন ফিরিয়া তাকাইল। এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে এই দিকে আসিতেছে। বৃদ্ধ একটি বৃক্ষের আড়ালে গিয়া লুকাইল। নিমেষে অশ্বারোহী তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল। ঐ দূরে অশ্ব চলিতেছে। বৃদ্ধ তাহাকে অনুসরণ করিল।

* * * * *

নয়নজলে সুচিত্রার বক্ষ বাস ভিজিয়া যাইতেছে। একান্ত মনে অপরেশের কথা স্মরণ করিয়া বৃক্ষগাত্রে হেলান দিয়া সে কাঁদিতেছিল। স্তিমিত নেত্র হইতে অশ্রুঝরণা বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে কে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। সুচিত্রা চমকিয়া চাহিল—দেখিল একদল লোক। তাহাদের মধ্যে একজন কহিল—আর দেরী করিস না শেষ কইরা দে।

অপর একজন বলিল—খাড়া না, এমন সুন্দরী মাইয়া একটু—প্রথম বক্তা বলিল,—যদি সর্দ্দার শুনে তবে কিন্তু···দ্বিতীয়—কহিল—একটু ইধার উধার নজর রাখিস।

সুচিত্রা বুঝিল দুর্বৃত্তেরা অত্যাচারের বাসনা করিয়াছে। উঃ! ইহার চাইতে মৃত্যুও যে শতগুণে শ্রেয়। মনে পড়িল, হায়! এই বনেই না কত অসহায়া নারী তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অত্যাচারে সতীত্ব হারাইয়াছে! সেই পাপের প্রতিশোধ ভাগবান কি তাহার উপর দিয়াই লইবেন? সুচিত্রা অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিল। দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তোমরা কে?

একজন বলিল—চাঁদবদনী সবই জাইনবা পরে।

—মানে?

মানে, আমাগো প্রিয়া হইয়া।

সুচিত্রাকে যে ধরিয়াছিল সেই ব্যক্তিটিকে সে এমন জোরে ধাক্কা দিল যে দুবৃর্ত্তটি দুই হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সে ক্ষিপ্র গতিতে পিস্তল বাহির করিল। কিন্তু তৎমুহূর্ত্তেই আরও চার পাঁচ জন দস্যু তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পতিত ব্যক্তি ধূলা হইতে

উঠিয়া গা ঝাড়িতে ঝাড়িত বলিল—বাবা, মাগীটারতো কেড়াই কম না। ঠায় আমারে ঠেইলা ফেইলা দিল। তা যাইকগ্যা চাঁদবদনীর ওষ্ঠ খান পাইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবনে।

বৃদ্ধটি দূর হইতে কতকগুলো লোকের জটলা দেখিতে পাইল। সে বনের ওধার ঘুরিয়া কি হইতেছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত গোপনে অগ্রসর হইল। দেখিল কয়েকজন লোক একজন যুবতীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একি! এযে!

একজন দুর্বৃত্ত কহিল—আর ওসব দিয়া কাম নাই অহন শেষ কইরা দে।

অপর একজন কহিল—কেনরে একটু রহস্যই না হয় কইরলাম?

সুচিত্রা বলিল—আমায় ছেড়ে দাও।

—চাঁদবদনী ছাইড়া দিমুইতো—তবে এট্টু হানি...

সুচিত্রা কহিল—সাবধান বদমায়েস।

—ওরে বাবা এহেবারে গুরখু সাপের বাচ্চা।

বৃদ্ধ বুঝিল দস্যুদল সুচিত্রার উপর অত্যাচার করিবে। তাহার ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্ত্তেই গুলি করিয়া কয়েকটিকে খতম করিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতে সুফলের আশা নেই। বরং উভয়কেই মরিতে হইবে। চক্ষের সম্মুখে দস্যুদলের সন্ধান পাইয়াও শাস্তি দেওয়া চলিবে না। কিন্তু উঃ! এ অত্যাচার যেন স্বচক্ষে দেখাও যায় না! না তাহাকে বাধা দিতেই হইবে। সে প্রস্তুত হইল। দস্যুগণ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মুখে শীকার পড়িলে ব্যাঘ্রের যেমন মনোভাব উপস্থিত হয় তেমনি মনোবৃত্তি লইয়া সুচিত্রাকে টানিয়া ধরিল। দস্যুদলের কামনার অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুচিত্রা তাহার সর্ব্বশক্তি দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধা প্রদান করিতে লাগিল।

এমন সময় দেখা গেল কে একটি লোক তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া এই দিকেই আসিতেছে। একজন দস্যু ত্রস্ত হইয়া

কহিল—সাবধান শেষ কইরা দে। শীগগীর শেষ কইরা দে। সর্দ্দার আসতাছে।

দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার নাকের ডগায় সুন্দর একজোড়া গোঁফ। ঠিক যেন মহাদেবের গোঁফের মতন। সে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কি হচ্ছে?

—হুঁজুর এই মাইয়া ছাইলাটি.........

—কি করছিল?

—এই গাছটার গোড়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাইনতাছিল। দস্যুসর্দ্দার সুচিত্রার প্রতি একটু ঘৃণা ব্যঞ্জক কটাক্ষ পাত করিয়া বলিলেন,— হুঁ নিশ্চয়ই কোন বিরহিনী হবে।

একজন দস্যু প্রশ্ন করিল,—তাহলে হুঁজুর শেষ কইরা দেই? মস্তক নাড়িয়া দস্যুসর্দ্দার উত্তর দিল—না না, কক্ষনো না। ওকে শেষ করলে ওতো মুক্তি পাবে। ওর জীবিত থাকা প্রয়োজন। প্রেমিকের বিরহ ওকে মৃত্যুর চাইতেও সহস্রগুণ জ্বালা দেবে জীবনে। বুকের দীর্ঘশ্বাসে ও মরবে তিলে তিলে শুকিয়ে। নারী! নারী! এই তার উপযুক্ত শাস্তি। যাও তোমরা সব।

এ কার কণ্ঠস্বর! সুচিত্রা চমকিয়া উঠিল। মনে হল যেন কত পরিচিত। দস্যুদল চলিয়া গেল। সর্দ্দার অশ্ব হইতে অবতরণ করিল—জানতে পারি কি সুন্দরী এখানে দাঁড়িয়ে কেন কাঁদছিলে?

গর্ব্বিত ভাবে সুচিত্রা উত্তর দিল—সে কৈফিয়ৎ কি আমাকে দস্যু সর্দ্দারের কাছে দিতে হবে?

একটু কটাক্ষ পাত করিয়া দস্যুসর্দ্দার কহিল—তা না হয় দিলেই। কি প্রিয়তমের বিরহে? তোমার মত সুন্দরীর যে ব্যক্তি মন জয় করতে পেরেছে সে সামান্য নয়। জিজ্ঞেস করতে পারি কে সেই রসিক নাগর? বৃদ্ধ কাঠুরিয়া বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহাদের

কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল। দস্যুসর্দ্দারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হঠাৎ সেও যেন চমকিয়া উঠিল। "কে ?—

সুচিত্রা কহিল : সে রসিক নাগর আর যেই হোক তোমার মতন লম্পট নয়। সে নির্দ্দোষ নারীর উপর অত্যাচার করে না। সে মানুষ। সে দেবতা।

দস্যুসর্দ্দার কহিল—কথার ভাবে মনে হচ্ছে তুমি কোন শিক্ষিতা নারী হবে। হয়তো বা কোন কলেজের ছাত্রী। কিন্তু সারা বাংলাদেশের স্কুল কলেজের মধ্যে এমন কোন ছাত্র আছে কিনা জানিনা যে ব্যক্তি দেবতা হবার উপযুক্ত। তুমি যখন কলেজের ছাত্রী তখন প্রেমও নিশ্চয়ই কোন কলেজের ছাত্রের সঙ্গেই হওয়া সম্ভব। সুতরাং সে যে দেবতা নয় সেকথা অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পারি।

সুচিত্রা বলিল—মুর্খ, তুমি থাক বনে, কলেজে দেবতা থাকে কি, না সে তুমি জানবে কি করে ? তুমি জান শুধু অসহায় নারীর উপর অত্যাচার করতে।

দস্যুসর্দ্দার বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল—হাঃ হাঃ হাঃ···নারী ! অসহায়া ! হাঃ হাঃ হাঃ······জাননা সুন্দরী নারী অসহায়া নয়। অনেক কুহকিনী শক্তিই তারা ধারণ করে।

সুচিত্রা গর্জ্জিয়া উঠিল—সাবধান দস্যু।

—তুমি দেখছি খুব রেগে গেছ। আচ্ছা থাক তবে ওকথা। জিজ্ঞেস করতে পারি, তুমি কোন কলেজে পড় ?

সুচিত্রা গর্ব্বিত ভাবে উত্তর দিল—বললে তুমি চিনবে ?

—হয়তো পারি।

সুচিত্রা একটি কলেজের নাম করিল।

দস্যুসর্দ্দার উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। হাঃ হাঃ হাঃ আমি নিজেই সেই কলেজর ছাত্র ছিলাম। সে কলেজে দেবতা আছে এ ধারণা যিনি করতে পারেন, আমি বলব চরিত্র সম্বন্ধেই তার

কোন ধারণা নেই। সেখানে বাস করে মানুষ নয় লম্পট জোচ্চোর আর···

কথাটি সুচিত্রার নিকট একান্তই অসহ্য বোধ হইল। বলিল—সাবধান দস্যু—সে লম্পট জোচ্চোর নয়।

বুঝলুম সে দেবতাই, কিন্তু তার নামটি জানতে পারি কি সতী?

—না।

—তবে বুঝব তোমার প্রেম কলঙ্কিত।

—মুখ সামলে কথা বলবে দস্যু। শুধু তুমি আমার ত্রাণকর্ত্তা বলে এতক্ষণ আমার সম্মুখে এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পাচ্ছ—নইলে...... ..

দস্যুসর্দ্দার একটু অবহেলার হাসি হাসিয়া বলিল—

—নইলে কি? মৃত্যুদণ্ড দিতে?

—হ্যাঁ, তাই দিতুম।

এবার দস্যু সর্দ্দার গম্ভীর হইয়া বলিল—তোমার প্রণয়ী যদি দেবতাই হতো তবে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারতে।

সুচিত্রা বলিল—"বললেই যে তুমি চিনবে তার মানে আছে? দস্যুসর্দ্দার একটু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল—আশা করি সে কলেজের ভাল ছাত্রছাত্রীদের নাম আমার অজানা নয়। As for example সুধীর, সুনীল, সুচিত্রা—, সুপ্রীতি—

সুচিত্রা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে তাকাইল—"ওদের কি করে চিনলেন?

"সে কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়তো আমার সম্ভব নয়।

"কিন্তু প্রধান জনের নামই যে বাদ রাখলেন:

"বলুন?

লজ্জিত বদনে সুচিত্রা কহিল—অপরেশ চট্টোপাধ্যায়।

হঠাৎ সরাসরি দস্যুসর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি! তুমি তাকে ভালবাস?

সুচিত্রা বদন নত করিল।

দস্যুসর্দ্দার তাহার নকল গোঁফ খুলিয়া ফেলিল—দেখতো আমায় চিনতে পার কিনা?

সুচিত্রা যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল —আপনি?

অপরেশ বলিল—ক্ষমা কর সুচিত্রা, এতক্ষণ আমি তোমায় জানবার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। নারীর উপর বৃথা অভিমান করে আমিই এতদিন ভুল কচ্ছিলাম। আজ আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে। জেনেছি নারী হীনা নয়, তারা ঘৃণ্যা নয়, তারা দেবী। আমি যে ভয়াবহ ঘৃণ্য পাপের অনুষ্ঠান করেছি, অসহায়া নারীর মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। সরকারের সতর্ক প্রহরীরা সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেও ক্ষণিকের তরে যার সন্ধান পায়নি সে দুর্দ্ধর্ষ দস্যু স্বেচ্ছায় তোমার নিকট ধরা দিচ্ছে। তুমি আমায় যে শাস্তি ইচ্ছা দাও সুচিত্রা। ইচ্ছা হয় পুলিসের হাতে দাও, নয় নিজে হাতে গুলি করে মার। উঃ! সে অত্যাচারের কথা আমি যে আর ভাবতে পাচ্ছি না। আমি কি করেছি! আমি কি করেছি! তুমি আমায় শাস্তি দাও সুচিত্রা! আমি অবনত মস্তকে তোমার সকল শাস্তি গ্রহণ করব।

সুচিত্রা কাতরোক্তি করিয়া উঠিল,—ওঃ তুমি! তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পার? নারীর বেদনা, সে তুমি কি বুঝবে। না-না-না তোমার ক্ষমা নেই। তোমার ক্ষমা নেই। শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে। হায় নিষ্ঠুর কবি।

সুচিত্রা অপরেশের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অপরেশ তাহার শিথিল কবরীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহাকে আরও শিথিলতর করিয়া দিতে লাগিল।

হঠাৎ—নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে বলিয়া উঠিল—

—তুমি ক্ষমা করলেও আমি করব না। শাস্তি ওকে নিতেই হবে।

অপরেশ ও সুচিত্রা চমকিয়া উঠিল। তাহারা দেখিল দাড়ি গোঁফওয়ালা বৃদ্ধ একটি লোক। লোকটি অপরেশকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল।

অপরেশ আর সুচিত্রা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল। সুচিত্রা অপরেশকে আরো শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল। ঠিক এমন সময় ওধার হইতে কাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: হাত তোল। ।পিস্তল ফেলে দাও।' অপরেশ আর সুচিত্রা পিছনে ফিরিয়া তাকাইল। বৃদ্ধটিও তাকাইল। সকলে দেখিল—: কয়েকজন কনেষ্টবলসহ একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। বৃদ্ধটি পিস্তল ফেলিয়া দিলেন। ইন্সপেক্টর বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বলিলেন:

—হাত তোল দস্যু।

তিনি প্রশ্ন করিলেন—তুমি কে?

উত্তর আসিল—দস্যুসর্দ্দার।

অপরেশ যেন সম্বিত হারাইল। সেই মুহূর্ত্তে সে বৃদ্ধটিকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। ওকি! ওযে খ্যাঁদা! সে ডাকিতে গেল—খ্যাঁদা। খ্যাঁদা। কিন্তু তাহার কণ্ঠ স্বরিল না।

দস্যুসর্দ্দার অপলক দৃষ্টিতে অপরেশের দিকে তাকাইল। সে দৃষ্টি যেন কহিতেছিল—আসি বন্ধু। বিদায়। তুমি কবি হয়ো। মানুষ হয়ো। আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক কোরো। অপরেশ নিশ্চল পাথরে পরিণত হইয়া গেল।

C. I. D. অফিসারটি সুচিত্রাকে চিনিতেন। ক্ষেত্রনাথবাবুর নির্দ্দেশ মতই তাহারা এই বনে আসিয়াছিলেন। সুচিত্রা একেলা বাহির হইয়া গেলে, তিনি পুলিশ দলকে তাহার রক্ষার্থে ঐ বনে প্রেরণ করেন। C.I.D. অফিসারটি সুচিত্রাকে কহিলেন,—নমস্কার সুচিত্রা দেবী। আমরা এবার আসি। তারপর অপরেশের দিকে তাকাইয়া তিনি একটু মৃদু হাসিলেন।

সুচিত্রা কোন উত্তর দিল না। সকলই যেন কেমন হেয়ালী বোধ হইতে ছিল। পুলিশদল দস্যু সর্দ্দারের সহিত বনের পথ বাহিয়া বিজয় উল্লাসে গমন করিতে লাগিল। সঙ্গে করিয়া তাহারা দস্যুসর্দ্দারের অশ্বটিকে লইতেও ভুলিল না। যতদূর সম্ভব দেখা যায় সম্মোহিতের মতন অপরেশ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে তাহারা দৃষ্টির বহিঃসীমায় চলিয়া গেলে যেন তাহার সম্বিত ফিরিয়া আসিল। সে উন্মাদের মত কহিয়া উঠিল—না না না! একি! ওরা কাকে নিয়ে গেল? ওতো দস্যুসর্দ্দার নয়! ওযে নির্দ্দোষ! দস্যুসর্দ্দারতো আমি। দস্যু সর্দ্দার আমি। তোমরা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাও। ফিরে আয়, ফিরে আয় খ্যাঁদা। ফিরে আয়।

অপরেশ সুচিত্রার বাহু বেষ্টন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া উহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিতে চাহিল। সুচিত্রা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল: এখন চেষ্টা করে লাভ নেই। আদালতে ওর মুক্তির ব্যবস্থা করব চল। এখন ওকে ফিরাতে গেলে ওর আরো বিপদ বাড়বে বই কমবে না। সুচিত্রা তাহাকে জোর করিয়া ফিরাইল। ততক্ষণ বন্দীসহ পুলিশদল বনের অপর পারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সুচিত্রা অপরেশকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া মোটর ষ্টার্ট দিল।

অপরেশের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

সুচিত্রা অপরেশের আরও নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে কবি?

অপরেশ অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিল—খ্যাঁদা।

সমাপ্ত